উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্যা

ধনঞ্জয় রায়

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ ১৩৬২

প্রকাশিকা ঃ
মঞ্জু দাশ
লেকটাউন,
কলিকাতা-৮৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
বিন্দু পাল

মুদ্রাকর ঃ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২নং বিডন রো,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কল্যাণীয়াসু

'পিউ' কে—

বাবা

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

দেবদারু বনে আগুন

প্রান্তরে নৈশ বৈরাগ্য

উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন (সম্পাদিত

রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন (যন্ত্রস্থ)

মঙ্গলাচরণ

সম্প্রতিকালে লোকজীবন নিয়ে গবেষণা বা আলোচনার অনেক সুযোগ এসেছে। তার প্রধান কারণ মানুষ একটা সাবেকী কথা বা প্রথাকে গ্রহণকরার পূর্বে তাকে নানা ভাবে বুদ্ধি-গ্রাহ্য করার বাসনা পোষণ করে। লোক (folk) সাধারণ অর্থে বৃহৎ জনসমষ্টি বোঝালেও বিশিষ্ট অর্থে আদিম-জীবনাবদ্ধ জনগোষ্ঠী বোঝায়, 'যাদের চিন্তায়, আচরণে জীবনের নানা কর্ম ধারার মাঝে বিদগ্ধ বা পরিশীলিত সমাজের মার্জনার ছাপ পড়েনি। ব্যষ্টি মানুষের কর্মোদ্যম, চিন্তন, কখন কী ভাবে যে সমষ্টিতে হারিয়ে যায় তার আর হদিশ পাওয়া যায় না। তাই লোক জীবনে বৃহত্তর গোষ্ঠী-জীবন নানাভাবে অনুরণিত। আমরা যদি হাজার হাজার বছর পিছিয়ে, আদিমানুষের সমাজ ও সভ্যতার কথা চিন্তা করার চেষ্টা করি, আদিম-সংস্কৃতির উৎস খুঁজে দেখতে চাই তখন স্তব্ধ-হওয়া কিছু কিছু রীতি-নীতির নিদর্শন (relic of the past) বা সাংস্কৃতিক রূপরেণুর ইঙ্গিত পাবো এবং তার মাঝদিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ও এক সূত্র দেখতে পাব যা দূরাগত সঙ্গীতের মূর্ছনার মত আমাদের আকৃষ্ট করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বকালের সর্বস্থানের মানুষ, বাঁচার তাগিদে তিনভাবে অভিযোজন করে। এই অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের জীবনের পথ-পরিক্রমার বৃত্তের হেরফের হয়। প্রথমত প্রকৃতি-পরিবেশ বা ভৌগোলিক আবেষ্টনীর সঙ্গে অভিযোজন, যা তাদের বস্তুকেন্দ্রিক দিনচর্যাকে নানা ভাবে শৃংখলিত করেছে। এক মানুষের বা গোষ্ঠীর সংগে অভিযোজন বা সামাজিক অনুশাসন যা বিশ্ব-দৃষ্টির বলয়কে প্রসারিত বা সংকুচিত করেছে, আর অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তির কল্পনা ও তাদের সাথে মানসিক ও আচরিত অনুষ্ঠানের অভিযোজন, যার মাধ্যমে নিশ্চয়তা পাবার এক আকুল আগ্রহ পরিস্ফুট, নানা আচরণ বা ধ্যান-ধারনার অনুশীলনে গুঞ্জরিত। সবকিছুই মানুষের কর্ম-কাণ্ড যা বাঁচার অনকূলে এবং জীবনও জীবিকাকে সাবলীল করার পথে এগিয়ে দেয়।

বর্তমান পুস্তকের গ্রন্থকার শ্রী ধনঞ্জয় রায় অতি নিষ্ঠার সংগে উত্তর বঙ্গের লোকজীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন বিদগ্ধ গোষ্ঠীর কাছে। এটাত ঠিক 'বঙ্গ' এই নাম এসেছে 'বোঙা' যা তথাকথিত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নাম। এই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশ হ'ল বর্তমানের সাঁওতাল, মুণ্ডা খেড়িয়া, ভূমিজ প্রভৃতি তথাকথিত উপজাতি যারা এই বাংলার বুকে বৃহত্তর সংস্কৃতির বুনিয়াদ রচনা করেছিল।

ভৌগোলিক বা পরিবেশ-পরিমণ্ডলের মানচিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানচিত্র ও পাল্টে যায়। পট ভূমিরও পরিবর্তন হয়। আগ্রাসী অন্য সভ্যতা আদিম বা প্রাচীন সমাজের বুকে নতুন পরশ বা ছোঁয়াচ রেখে যায়। কালক্রমে তারও কায়া বদল হয়। কিন্তু তার সবখানি হারিয়ে যায় না। এই পুস্তকের নানা অংশে সেই হারিয়ে যাওয়া বা নতুন ভাবে মিশে যাওয়া বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের প্রতিবিম্বন পাওয়া যাবে এবং বিদগ্ধ সমাজকে আকৃষ্ট করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক শ্রী ধনঞ্জয় রায় যেভাবে এই সকল বিষয়ের প্রতিবেদন অত্যন্ত বস্তু নিষ্ঠ চিন্তার মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন সেজন্য তাঁকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সূচীপত্র

লৌকিক দেবদেবী

উত্তরবঙ্গের গ্রামীন লোকজীবনে বিশেষকরে ছোটদেশী, বড়দেশী, পলি, বাবুপলি, কোচ, রায়কত, দেবংশী, মালি, বরঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজিত হ'তে দেখা যায়। বংশপরম্পায় চলে এইসব দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ ও লোকাচার। এইসব দেবদেবী হ'ল পরিবারে ও সমাজে সমস্ত শুভ ও অশুভের ত্রাণ কর্তা। দেবদেবতার প্রসন্ন ও অপ্রসন্নতার উপর নির্ভর করে নিজের ও দশের মঙ্গলও অমঙ্গল। তাই, দেবদেবীর প্রতি এরা অন্ধবিশ্বাসী এবং দেবদেবতার প্রভাব এদের জীবনে অপরিসীম।

ভূমির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, আপদ বিপদ নাশ, মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি লৌকিক ব্রতকে ঘিরে পূজিত হয় বিভিন্ন দেবদেবী। যা শান্তি ও সান্তনার আশ্রয়স্থল রূপে চিহ্নিত। মাটি দিয়ে তৈরী বেদী, বাঁশ, কলাগাছ, তুলসীগাছ, আগুন প্রভৃতি প্রতীকে উদ্ভাসিত হয়ে দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠে। রামানন্দ, নিত্যানন্দ, বলরাম ও জগমোহন এই চার লৌকিক দেবতা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করেন। মাটির বেদীই এই চার লৌকিক দেবতার বিমূর্ত প্রতীক।

পূজার উপকরণ রূপে তেল-সিন্দুর, পান-সুপারি, দুধ-দই, ঘি-মধু, খৈ-মুড়কী, মুড়ি-চিড়া, কলা-চিনি ও বিভিন্ন রকমের ফল এবং শস্য ব্যবহার করা হয়। হাঁস, কবুতর ও পাঁঠার রক্ত দিয়ে কিছু কিছু দেবদেবীর পূজা হ'তে দেখা যায়। কখনও কখনও পূজা উপলক্ষে, মেলা বসে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে আত্মীয় কুটুমের সাক্ষাৎ দর্শন পারস্পরিক ভাব ও কুশল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে পূজায় যোগ দেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই এর প্রধান অঙ্গ।

দেবদেবীদের অধিকাংশ পূজাই পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা করেন। শুধু মাত্র বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণে মণ্ডল বা অধিকারী বা গোঁসাইদের ডাক পড়ে। এদের সমাজে এক কালীই বহু নামে চিহ্নিত। এছাড়া, বিষহরি, জিতুয়া ঠাকুর, মহারাজা, ডাংধরা, কুমিরদেব, কানঠাকুর, জলখুকি,

ছোট ও বড় বসুমতী, মদনকাম, গাবুর, ভাণ্ডালী, তিস্তাবুড়ী প্রভৃতি দেব-দেবীর নাম স্মরণযোগ্য। 'বারলিয়া' পূজায় মুসলিম সমাজের পীর পূজিত হন। মুসলিম সমাজের মেথিনীদেও দেবীকে বিবাহ অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা পূজা করেন। নবান্ন উৎসবে মহামারী ঠাকুর ও দুয়ারি-কুয়ারি দেবতার পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। এইসব দেবদেবীর অধিকাংশরই আস্তানা বাড়ীর উঠোন, জমিবাড়ী এবং চালের বাতার ভেতর। কোন কোন দেবদেবীকে থান ও মন্দির করে রাখা হয়।

ভূমির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন সংক্রান্ত পূজা

ভূমির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেবতার পূজা হয়। জমিতে হালকর্ষণ, ধান্যরোপন, বিছন ফেলা, ফসল রক্ষা প্রভৃতি রীতি উপলক্ষে পূজার প্রচলন সাড়ম্বরে পালিত হয়। যেমন—

হালযাত্রা : দশমী পূজার দিন 'হালযাত্রা' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন হাল গরু মাঠে নিয়ে গিয়ে জমিতে আড়াই পাক হাল দেবার পর হাল থামিয়ে হালের গরুর পা ধুইয়ে এবং হালকে পরিষ্কার করে তেল সিন্দুর মাখিয়ে ধূপধুনা দিয়ে পূজা হয়। বছরে এই পূজা সবাইকে করতে হয়। এদের ধারণা, হালযাত্রা না হলে জমিতে সারা বছর হাল দেওয়া যায় না।

গোছোর পানা : শ্রাবণ মাসে এই পূজা হয়। ধান বোনার সময় ক্ষেতের এককোণে একটি কলাগাছ পুঁততে হয়। সেখানে কালো-কচু, কলাই, সরিষা, কলা, ধান ও দুর্বা, তেল-সিন্দুর ও ধূপধুনা দিয়ে পূজা হয়। পূজার শেষে কিছু ধানের রোপা জমির এককোণে বুনে দিয়ে ধান্য রোপন শুরু হয়।

মাটি সুড়াই : কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতে পূজা হয়। পূজার উপকরণ, আটা, দুধ-কলা, ধান-দুর্বা, তেল-সিন্দুর, ধূপ-ধুনা ইত্যাদি। প্রথম দিন বিকেলের দিকে পূজা শুরু হয়। পরদিন হাঁস, পায়রা প্রভৃতি বলি দিয়ে সকালের দিকে এই পূজা শেষ হয়। ক্ষেতের ফসল যেন পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, ফসল যেন ভালভাবে ঘরে আসতে পারে সেজন্যই 'মাটি সুড়াই' পূজার প্রচলন। মাটির একটি স্তুপ বানিয়ে এই পূজা হয়।

ভুঁইরাজা : ধান বোনার শেষ দিনে ভুঁইরাজা পূজা শুরু হয়। মাটির থান বানিয়ে এই পূজা হয়। পূজায় লাগে কাঁচা দুধ, আতপচাল, ধান-দূর্বা, তেল-সিন্দুর প্রভৃতি। হাঁস ও পায়রা বলি দিয়ে পূজা শেষ হয়।

হাট 'ব' : বড় হাটে বা ছোট হাটে তিন রবিবার উপবাস থেকে এই পূজা হয়। পূজার উদ্দেশ্য হ'ল শরীর স্বাস্থ্য ভাল রাখা এবং উৎপাদিত জিনিস যেন সারাবছর হাটে ভালভাবে বিক্রী হয়। পূজার উপকরণ ধূপ-ধুনা, চিনি-বাতাসা ইত্যাদি।

গরু চুমা : গরুর স্বাস্থ্যভাল রাখার জন্য এই পূজার প্রচলন। কালী-পূজার অমাবস্যায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে 'গরুচুমা'র ধুম পড়ে। ঐ দিন গরুকে স্নান করিয়ে গোয়ালে রাখা হয়। পরে কুলায় করে ধান-দূর্বা, ধূপ-ধুনা, তেল-সিন্দুর গরুর মাথায় দিয়ে পূজা শেষ করে।

দোগা : বাড়ীতে মহিষ থাকলে 'দোগা' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'দোগা' পূজায় লাগে কলার ছড়া, কড়ি, হরতুকী, তিল, পঞ্চশস্য প্রভৃতি। মহিষকে স্নান করিয়ে মহিষের মাথায় তেল-সিন্দুর মাখিয়ে দেয়। পরে মহিষের দড়ি বাঁধার খুঁটিকে তেল সিন্দুর মাখিয়ে ঐ খুঁটি গর্তে বসিয়ে পূজার সমাপ্তি হয়।

দলছিটা : জমির ফসল ভালভাবে হবার জন্য দলছিটা পূজার প্রচলন। অফুরন্ত ফসল জমিতে ফলেছে তাই জমিকেও কিছু দিতে হয়, এই বিশ্বাস থেকে 'দলছিটা' পূজার প্রচলন হয়েছে। এদের ধারনা 'দল' অর্থ সার। দলছিটা অর্থাৎ সার ছিটানো। আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথমে লেবুর পাতা ভাজা তার সাথে খোল মিশিয়ে দুধ, জল, ধূপধুনা দিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দেয়। জমির উত্তর ও পূর্ব কোনে এই পূজা হয়।

ছেঁপুয়ান : ক্ষেতের ফসলের উপর যেন কারু লোভ না গিয়ে পড়ে এরজন্য 'ছেঁপুয়ান' পূজার প্রচলন। কাঁড়ি দিয়ে তৈরী মানুষের মত হাত ও পা দেহ তৈরী করে পোড়া হাঁড়িতে চোখমুখ আঁকিয়ে 'ছেঁপুয়ান' ঠাকুর তৈরী হয়। কার্ত্তিক মাসে কালীপুজার দিন, কালী ঠাকুর পাটে উঠার সময় ছেঁপুয়ান ঠাকুরকে চিনি বাতাসা, ধূপধুনা প্রভৃতি সহযোগে পূজা করে ক্ষেতের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

গোয়ালচণ্ডী : গোয়াল ঘরের সামনে কালী, বিষহরি, ভগবতী, চণ্ডী

ও বাউকালীর পূজা করে গোয়াল চণ্ডী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষরা এই পূজা করেন। পূজার জন্য লাগে নতুন কাপড়, কলার দড়ি, ঘি, মধু, কলা, আতপ চাল, তুলসীপাতা, বেলপাতা প্রভৃতি।

আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ত পূজা

আবহাওয়া ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পূজার প্রচলন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টি তাই জলের প্রয়োজন অথবা দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, বৃষ্টি থামানো দরকার। এ-সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, পৌষ-সংক্রান্তি, নষ্টচন্দ্র প্রভৃতি পূজারও প্রচলন রয়েছে। আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ত পূজা যেমন—

জলমাঙ্গা ঃ দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি বা খরা চলছে, জমিতে জলের প্রয়োজন তখন জলমাঙ্গা পূজার আয়োজন হয়। এই পূজার জন্য মেয়েরা লাঙ্গল, গরু, মই, হালুয়া-হালুয়ানী, পান্তা দেওয়া, হুকা দেওয়া, বিছন তোলা, বিছন গাড়া প্রভৃতি সেজে অভিনয় করে এবং গান গায়। পূজার দিন রাত্রে কেউ নিতান ঠাকুর বা জগমোহন ঠাকুরের কাছে ধান-দুর্বা, আতপ চাল, কলা, চিনি দুধ, তেল-সিন্দুর, ধূপ-ধুনা প্রভৃতি দিয়ে পূজা দেওয়ার পর কখনও পাঁচজন কখনও নয়জন মহিলা সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়, এবং এদের মধ্যে একজনের মাথায় জলপূর্ণ ঘট থাকবে, প্রত্যেকেই মাঠে যাবে। মাঠে গিয়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টি হওয়ার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ঘরে ফিরবে। ঐদিন গ্রামের পুরুষেরা কেউ বাড়ীতে থাকে না। পরে ঐ মহিলারা বস্ত্র পরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য রান্নার ব্যবস্থা করেন। ঐদিন রাত্রিতে প্রত্যেকেই জেগে কাটিয়ে দেন।

হরিলাঙ্গল-কোদালখিল-চুনি চোখাই ঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিতে জমিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরজন্য হরিলাঙ্গল, কোদালখিল ও চুনি চোখাই পূজা হয়। পূজা করে সাধারণতঃ যারা নিঃসন্তান তারাই। পূজা হয় রাত্রিতে। পূজায় একজন পুরুষ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বাড়ীতে যেখানে গোবর রাখা হয়, সেখানে হরিলাঙ্গল, কোদালখিল ও চুনিচোখাইকে ধূপ, সিন্দুর, চিনি-বাতাসা দিয়ে পূজা করে বৃষ্টি থেমে যাবার জন্য প্রার্থনা জানায়। পরে হরিলাঙ্গল, কোদালখিল ও চুনিচোখাইকে ঐ গোবরের ঢিপির মধ্যে গেঁথে দেয়। জনশ্রুতি, এই পূজা ভীষণ জাগ্রত। পূজা করার সময় কোনও অনিয়ম হলে পরিবারের

মানুষজন মারা যায় বলে এদের ধারণা, হরিলাঙ্গল হ'ল সম্পূর্ণ লাঙ্গল; কোদালখিল হচ্ছে—কোদাল ডাণ্ডাতে লাগানোর সময় যে খিল ব্যবহার হয় এবং চুনি চোখাই বলতে চূণ বোঝানো হয়েছে।

তিলবাড়া ঃ পৌষ-সংক্রান্তিতে 'তিলবাড়া' পূজা হয়। তুলসী-বেদীর সামনে তিল, গুড়, তেল ও আতপ চালের গুঁড়া, কলা ও ফলফলারী প্রভৃতি সহযোগে এই পূজা হয়। গভীর রাত্রিতে অথবা খুব ভোরে এই পূজা হয়।

কুরষি ঃ কালীপূজোর দিন রাত্রিতে 'কুরষি' অনুষ্ঠিত হয়। 'কুরষি'র জন্য লাগে লাঙ্গল আর কাদা। চিনি-বাতাসা, তেল-সিন্দুর, কলা, ধূপ-ধুনা দিয়ে লাঙ্গল আর কাদাকে পূজা করে কুরষি শুরু হয়। পূজা শেষ হলে গ্রামের ছেলেরা ঐ কাদা গায়ে মেখে অপরের বাড়ীতে ফলফলারি বা ক্ষেতে বোনা ফসল চুপ করে ছিনিয়ে মজা করে।

দধিকাঁদো ঃ ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই পূজার প্রচলন। খোলা মাঠে একটা বাঁশ পুঁতে ঐ বাঁশের চারধারে মাটি দিয়ে বেদী বানানো হয়। বেদীর উপরে থাকে একটি নারিকেল। কলা-দুধ-দই ও বিভিন্ন রকমের ফলফলারি, ধূপধুনা, দূর্বা প্রভৃতি পূজার উপকরণ। বেদীর সামনেই স্বল্প জায়গা জুড়ে কাদা তৈরী করা হয় এবং পূজার সময় পাঁচজন শিশুভক্ত বাঁশের চারধারে ঘিরে থাকে। গৃহকর্তা যখনই বেদীর উপরে দুধ ও দই ঢেলে দেয় তখনই ঐ পাঁচজন শিশু নারিকেল নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলে পূজা শেষ হয়। পরে গ্রামের যুবক ছেলেদের মধ্যে 'দধিকাঁদো' খেলার ধুম পড়ে যায়। 'দধিকাঁদো' খেলায় বিজয়ী খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয়।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত পূজা

কঠিন অসুখের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখা ও নবজাতক শিশুর মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা হয়। যেমন—

আটঘাটি ঃ ভাদ্র মাসে পূর্ণিমার পরের দিন সারাদিন উপবাস থেকে 'আটঘাটি' পূজা হয়। নিজের শরীর স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে, দুষ্টু গ্রহের উপদ্রব যেন না হয় সেজন্যই 'আটঘাটি' পূজার প্রচলন। পূজার উপকরণ, নারিকেল, বাদাম, চিনিবাতাসা, মাকুই (ভুট্টা), ধূপধুনা প্রভৃতি।

কুঁইছোয়া ঃ বাড়ীতে নবজাতক শিশুর জন্ম উপলক্ষে 'কুঁইছোয়া'

পূজার প্রচলন। নবজাতকের জন্মের পাঁচ অথবা দশদিন পরে এই পূজা হয়। বাড়ীতে কারু যদি ঘোড়া থাকে তার বাচ্চা হলেও 'কুঁইছোয়া' পূজা হয়। ধান-দূর্বা, তেল-সিন্দুর, চিনি-বাতাসা সহযোগে পাড়ার পাঁচজন মহিলা কুয়োতলায় পূজা দেন। পূজা শেষ হলে ঐ পাঁচজন মহিলার অন্ন ভোজনের ব্যবস্থা গৃহস্বামীকেই করতে হয়।

চখচুন্নি ঃ গ্রামের যুবক ছেলেদের স্বাস্থ্যের মঙ্গলার্থে 'চখচুন্নি' পূজার প্রচলন। কালী পূজার অমাবস্যায় দুইদিন জুড়ে এই পূজা চলে। তিনটি পাটকাটি মাটিতে পুঁতে মাথার কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাটকাটির উপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে 'চখচুন্নি' পূজা হয়। পূজার প্রসাদরূপে মুড়ির নাড়ু ব্যবহার হয়। গ্রামের ছেলেরা পূজা উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গেয়ে চাল-ডাল তরি-তরকারী সংগ্রহ করে। পূজা শেষ হলে সংগৃহীত চাল-ডাল, তরি-তরকারী একত্রে রান্না করে পূজার প্রসাদরূপে প্রত্যেকেই তা গ্রহণ করে। পূজা শেষ হলে পূজার সমস্ত উপকরণ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ভেদাই ঃ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন 'ভেদাই' পূজা হয়। পূজার তিনদিন আগে পাড়ার মহিলারা প্রত্যেক বাড়ীতে গান গেয়ে চাল-ডাল তরি-তরকারী সংগ্রহ করে। মাঠে মাটি দিয়ে বেদী বানানো হয়। ঐ বেদীই হ'ল ভেদাই ঠাকুর। দুধ কলা ঘি আতপ চাল দিয়ে ভেদাই ঠাকুরের সিধা দেওয়া হয়। মহিলারা রাত্রিতে এই পূজা করে। পূজার শেষে সংগৃহীত চাল-ডাল, তরি-তরকারী রান্না করে পূজার প্রসাদ রূপে তা বিতরণ করা হয়। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যই ভেদাই পূজার প্রচলন।

খোঁজাগর বা খোঁজাখুঁজি ঃ লক্ষ্মী পূর্ণিমার দু'দিন পরে গ্রামের ছেলেরা খোল-করতাল প্রভৃতি সহযোগে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে চাল-ডাল তরি-তরকারী সংগ্রহ করে। পরে মাটি দিয়ে বেদী তৈরী করে 'খোঁজাখুজি' ঠাকুরের পূজা হয়। পূজা শেষ হলে চাল-ডাল তরি-তরকারী একত্রে রান্না করে পূজার প্রসাদরূপে প্রত্যেকের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।

বাৎসারাৎ ঃ শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশু যেন বেশী কান্নাকাটি না করে সেজন্য 'বাৎসারাৎ' ঠাকুরের পূজা হয়। চালের গুঁড়া দিয়ে বড়া তৈরী করে 'বাৎসরাৎ' ঠাকুরের ভোগ হয়। পূজায় লাগে তেল-সিন্দুর, ধান-দূর্বা ও ধূপ-ধূনা।

আপদ বিপদ নাশ সংক্রান্ত পূজা

আপদ বিপদ এলে তা নাশের জন্য বিভিন্ন পূজার প্রচলন রয়েছে। এসব পূজার উদ্দেশ্য গ্রামের সার্বিক উন্নতি ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা যেন বজায় থাকে। যেমন—

বারলিয়া ঃ পাঁচকালি, বড়বসুমতী, ছোটবসুমতী, জলখুকি, চামারি বাসন্তি, কান ঠাকুর, মহারাজা ঠাকুর, বুড়ীঠাকুর, নরসিংহ, হনুমান, পীর ও শিবঠাকুর এই বার দেবতা নিয়ে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে 'বারলিয়া' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় মণ্ডলের ডাক পড়ে। সমাজের প্রত্যেকের কাছে মণ্ডল 'ভাঙ্গন' তোলেন। ভাঙ্গন অর্থ অর্থ-কড়ি। তোলা অর্থ-কড়ি জমিয়ে এই পূজায় খরচা হয়। পূজায় লাগে কলার ছড়া, আতপ চাল, দুধ-দই, পঞ্চশস্য। নতুন কাপড়, বিভিন্ন ধরনের ফলফলারি প্রভৃতি। পূজায় হাঁস কবুতর ও পাঁঠা বলি হয়।

অথাই পথাই 'ব' ঃ কালী পূজার তিন চার দিন পরে এই পূজা হয়। গ্রামের ছেলে মেয়েরা রাস্তা ঘাটে বিপদে আপদে যেন না পড়ে সে কারণে এই পূজার প্রচলন। পূজায় লাগে শোলার ফুল, চারটি কাঁচাবাঁশের ছোট ছোট কাঠি। রাস্তার ধারে চারটি কাঠি গেড়ে শোলার ফুলগুলি তার উপরে দেওয়া হয়। মহিলারা এই পূজা করেন। সারাদিন উপবাসের পর এই পূজা হয়।

গুটি 'ব' ঃ ফালগুনের প্রথম দিকে এই পূজা হয়। মাটিতে উত্তর দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে ৯ হাত অথবা ১১ হাত অথবা ১৫ ও ১৯ হাত জায়গা জুড়ে ডানে ও বাঁয়ে সারি সারি মুরখী ভর্ত্তি মাটির কলস সাজানো থাকে। গ্রামের অনেকেই সেখানে একত্রিত হয়ে ঐ কলসের চার ধারে আতপ চাল, ফুল, কুল, কড়ি প্রভৃতি ছিটিয়ে ছিটিয়ে পাঁচবার ঘোরেন। গুটি 'ব' পূজায় হাঁস ও পায়রা বলি হয়। পূজা উপলক্ষে গ্রামের বিভিন্ন হাট ও বাড়ী থেকে গান গেয়ে গেয়ে চাল-ডাল তরিতরকারী সংগ্রহ করে পূজার ভোগ রান্না হয়। দশের ও গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্যই এ পূজার প্রচলন।

মুরলী ঃ নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করার সময় মুরলী পূজা হয়। বিশেষ করে শ্রীপঞ্চমীর দিনে রাত্রিবেলায় এই পূজা হয়। পূজার জন্য লাগে বাঁশের

খুঁটি, একটি তীরধনুক, ধানের শীষ, লাল কাপড় প্রভৃতি। পূজা হয়ে গেলে তিনদিন রাত্রিবেলায় ঐ জমির উপর থাকতে হয়।

খাদ্য খাবার সংক্রান্ত রান্না ঘরের দেবতা

রান্নাকরা খাদ্য খাবার দিয়ে দেবতার পূজা হ'তে দেখা যায়। এইসব দেবদেবীরা সাধারণতঃ রান্নাঘরের ভেতরে অথবা রান্নাঘরের চালের ভেতরে থাকে। এঁদের মধ্যে মৈথিনীদেও, মহামারী, কনকালী, দুয়ারি-কুয়ারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁরা খুব জাগ্রত বলে লোকের বিশ্বাস।

মৈথিনীদেও ঃ রান্নার জন্য শুধুমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠানে 'মৈথিনীদেও' দেবীর পূজা হয়। ক্ষত্রিয় সমাজে এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। জনশ্রুতি, এক ক্ষত্রিয় পরিবারে বিবাহ উপলক্ষে রান্নার জন্য কাউকে দেখছে না বলে গৃহকর্তা সজোরে বলে উঠলেন, 'কৈ কহিছুনু' ? অর্থাৎ কেউ কোথাও নেই ? পরিবারের লোকজন এ কথার অর্থ সঠিক বুঝতে না পেরে 'কৈ' অর্থাৎ 'মৈথিনী' নামক মুশলিম মেয়েটিকে গৃহকর্তা রান্না করার জন্য ডাকছে বলে ধরে নেয়। 'কৈ' কে রান্নার জন্য ডেকে আনা হ'ল এবং তাকে দিয়ে রান্নার কাজ করানো হ'ল। বিবাহ অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার সময় আত্মীয় কুটুম ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা রান্না কে করেছে জানতে চাইলে 'কৈ' নামক মুসলিম মেয়েটির কথা জানাজানি হয়ে যায়। ফলে, বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অতিথিরা এ ঘটনায় অপমানিত বোধ করে এবং না খেয়ে চলে যায়। যেহেতু, মুসলমানের দ্বারা রান্না হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিবারের প্রত্যেকেই মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং পরে পরিবারের কয়েকজন ক্ষুব্ধ হয়ে 'কৈ' নামক মুসলিম মেয়েটিকে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলে। এরপর থেকেই মৈথিনীদেও পূজার প্রচলন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে রান্না হয়ে গেলে যা যা রান্না হয় সে সব সামগ্রীর সমস্ত অল্প অল্প করে রান্নাঘরে সব খাদ্য খাবারের সামনে 'মৈথিনীদেও' দেবীর ভোগ দেওয়া হয় এবং পূজা করা হয়। বাড়ীর মাথু বা মালিক এই পূজা করেন। সারাদিন উপবাস থেকে তিনি রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় 'মৈথিনীদেও' দেবীকে পূজা দেন। পূজা শেষ হলে বিবাহ অনুষ্ঠানে খাদ্যখাবারের পর্ব শুরু হয়।

মহামারী ঃ রান্নাঘরের আরেক দেবতা 'মহামারী ঠাকুর'। বছরে একবার নবান্নের দিন মহামারী দেবতার পূজা হয়। ঐ দিন রান্না ঘরের চাল থেকে মহামারী ঠাকুরকে নামিয়ে (একটি সরার মধ্যে মানুষের মূর্ত্তি আঁকা) নতুন চালের ভাত ও বিভিন্ন রকম রান্না করা তরকারী অল্প অল্প করে নিয়ে কলাপাতায় ভোগ দেওয়া হয় ও মহামারী ঠাকুরের পূজা হয়। বাড়ীর মালিক এই পূজা করেন।

কনকালী ঃ প্রতিদিন রান্নাঘরে 'কনকালী'র ভোগ ও পূজা হয়। বাড়ীতে যেদিন যা রান্না হয় সেই রান্না করা খাদ্যবস্তু দিয়ে কনকালীর ভোগ হয়। গৃহস্বামী খেতে বসার আগে 'কনকালী'র পূজা দিয়ে রান্নাঘরের দরজা কিছুক্ষণ বন্ধ করে রাখেন। পরে খাবার খেতে বসেন। 'কনকালী' অনেক পরিবারে গৃহদেবতা রূপে চিহ্নিত।

দুয়ারীকুয়ারী ঃ রান্নাঘরের দরজার উপরে এই দেবতার বাস। নবান্নের দিন সমস্ত কিছু রান্না করা ভোগ্যবস্তু দিয়ে এর পূজা হয়। অথবা অগ্রাহয়ণ মাসের যে কোনও এক রবিবারে এরপূজা দিতে হয়।

মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত পূজা

মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিভিন্ন পূজার প্রচলন রয়েছে। যেমন—

হকাহকি বা উল্কা ঃ কালী পূজার অমাবস্যায় হকাহকি বা উল্কা পূজা হয়। মাটির বেদী বানিয়ে ধূপধূনা, সিন্দুর ও চিনিবাতাসা দিয়ে পূজা হয়। পূজার শেষে গ্রামের মানুষজন পাটকাটিতে আগুন জ্বালিয়ে উপরের দিকে তুলে ধরে হকাহকি বা উল্কা শুরু করে। মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই পূজার প্রচলন।

উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গ্রামান্তরে গেলে রাজবংশী সমাজে এই সব লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। তবে স্থানভেদে পরিবেশ ও আবহাওয়া গত প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এদের পূজার পদ্ধতি ও দেবদেবীর নাম কিছুটা পরিবর্তিত হ'তে দেখা যায়।

পূজা পার্বন ও লোক উৎসব

চৌ-প্রহরি ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে 'চৌ-প্রহরি' ও 'রাখাল ভোজন' উৎসব পালিত হয়। ঐ দিন বাড়ীতে রন্ধন কার্য নিষেধ। মধ্যাহ্নে ঐ দিন দৈ, খৈ, দুধ, মুড়কী, মিষ্টি, মণ্ডা প্রভৃতি খাদ্য খাবার পরিবেশিত হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী 'চৌ-প্রহরি' অনুষ্ঠান কেউ কেউ দুদিন ধরে করেন, একে জোর চৌ-প্রহরি বলে। 'চৌ-প্রহরি'তে সত্য নারায়ন পূজা, দধিমঙ্গল ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। 'চৌ-প্রহরি' অনুষ্ঠান শেষ হলে 'রাখাল ভোজন' পর্ব শুরু হয়। ঐ দিন পরিবারের ছেলেরা রাখাল সেজে হাতে লাঠি নিয়ে মাঠে গরু চরাতে যায়। কিছুক্ষণ পর মাঠ থেকে ফিরে এলে যেখানে ধুমাল অর্থাৎ হরিনাম সংকর্ত্তীন শেষ হয় সেখানে সবাই একত্রিত হয়। ঐ জায়গায় একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে 'মুড়কী' থাকে। ঐ মুড়কী তখন গোঁসাই ঠাকুর রাখালদের হাতে তুলে দিলে 'মুড়কী' ভোজনের মধ্য দিয়ে 'রাখাল ভোজন' পর্ব শেষ হয়।

আঠ্ওয়ারী ঃ 'আঠ্ওয়ারী' অর্থাৎ অষ্টমঙ্গল উপলক্ষে খাদ্যখাবারে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আঠ্ওয়ারী'তে নববিবাহিতা কন্যার মা-বাবা ভাই-বোন আত্মীয়, কুটুম, প্রত্যেকেই নতুন কুটুম অর্থাৎ নব বিবাহিতা কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন। সাথে ধানদুর্বা, একটি নতুন মাটির কলসিতে দুধ, নতুন শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে যায়। নববিবাহিতা কন্যার আত্মীয় কুটুম প্রমুখেরা নতুন কুটুমের গৃহে উপস্থিত হলে নব বিবাহিতা কন্যা অঙ্গনের দরজা খুলে দেয় এবং ওখানে দাঁড়িয়ে কন্যার ভাই নতুন কলসীর দুধ, নতুন শাড়ী তার হাতে তুলে দেয়। পরে বাবা মা ও আত্মীয় কুটুমেরা নব বিবাহিতা কন্যাকে ধান-দুর্বা দিয়ে বরণ করে। এরপর আত্মীয় কুটুমদের মিষ্টি মণ্ডা ও পান খাওয়ার পর্ব শুরু হয়। প্রসঙ্গত জানাই, নববিবাহিতা কন্যার বাবা, মা তখনও কিছু খায় না। খাদ্যখাবারের অনুষ্ঠান শুরু হলে কন্যার আত্মীয় কুটুমের সাথে মা বাবা ও খেতে বসে। সেদিন যা যা রান্না হয় সেইসব সামগ্রীর সবকিছু একটি পাত্রে ভাতের সাথে মেখে নিয়ে প্রথমে বাবার পাতে দিয়ে প্রণাম করে। বাবাও এর পরিবর্তে কিছু অর্থ দান করেন। অনুরূপভাবে মার কাছেও এরকম ভাবে জামাই মেয়ে খাবার তুলে দেবার পর

প্রথমে দৈ, চিড়া, মিষ্টি, মণ্ডা প্রভৃতি খাবার পর—পরে ভাত-ডাল, তরি তরকারী, মাছ বা মাংস প্রভৃতি খাবার পরিবেশিত হয়। আঠ্ওয়ারী অনুষ্ঠানে কন্যার বাবা মা নববিবাহিত কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে না খেলে যতদিন পর্যন্ত না মেয়ের ছেলেমেয়ে হচ্ছে অর্থাৎ, কন্যার বাবা মা যতক্ষণ পর্যন্ত না 'দাদু' ডাক শুনতে পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মা বাবা মেয়ের বাড়ীতে খায় না। যদি কোনও কারণবশতঃ খেতে হয়। তাহলে কন্যার বাড়ীতে কন্যার বাবা মা নিজ খরচে খান।

নবান্ন ঃ লোক উৎসবের একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান নবান্ন উৎসব। উৎসবের দিনে বাড়ীর উঠোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গোবর জল দিয়ে লেপে শুকনোর পর উঠোন থেকে খইলান পর্যন্ত আলপনা দেওয়া হয়। ঐদিন একটি খড়ের 'বুতি' তৈরী করে আগুনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন 'কইচাবাহক' (বাহুং) সোলার ফুল, জলন্ত প্রদীপ, কলাপাতা, কাঁচি এলুয়া ঘাস, পাট-খড়ি, পান-সুপারী, ঘটপাতা প্রভৃতি নিয়ে নিজের ধান ক্ষেতে গিয়ে ধানের পাঁচটি গোছা বা থোপে একসঙ্গে এলুয়া ঘাস ও সোলার ফুল দিয়ে বেঁধে পরে সেই বাঁধনের উপর অর্থাৎ ধানের গোছার উপরে কলাপাতা বেঁধে 'কইচা' দিয়ে কেটে নিতে হয়। পরে ঐ ধানের গোছা বা থোপ ঘটপাতার উপর রেখে তেল সিন্দুর দিয়ে ধূপধূনো দিয়ে পূজা হয়। এরপর আলপনা ছিটিয়ে দিয়ে নমস্কার করে ঐ ধান ক্ষেতেরই পাঁচ আঁটি বা নয় আঁটি অথবা ৫½ বা ৯½ গণ্ডা ধানের আঁটি 'কইচা' দিয়ে কেটে বাঁহকে বেঁধে এনে পরিষ্কার জায়গায় রাখা হয়। পরে, উঠোনে তেল-সিন্দুর দিয়ে আলপনা ছিটিয়ে প্রণাম করে ধান ঝাড়তে হয়। কাঠার উল্টোদিকে সেই ধান মেপে ঢেঁকির মাথায় তেল সিন্দুর দিয়ে সেই ধান ভাঙ্গতে হয়। এইভাবে ঐ ধানের চাল হবার পর নতুন মাটির হাঁড়িতে চালগুলো ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর তুলসী বেদীর সামনে কলা, চিনিবাতাসা, গুড়, কাঁচা দুধ, দই, মুলা, শসা, আখ ইত্যাদি উপাচারের মাধ্যমে পূজা হয়। নবান্ন উপলক্ষে প্রথমদিন দুপুরে নিরামিষ রান্না হয়। পরদিন মাছ-মাংস, বিভিন্ন পদের ডাল তরি-তরকারী রান্নার ধুম পড়ে।

জীমূত বাহন ঃ 'জীমূত বাহন' পূজা উপলক্ষে গ্রামবাংলা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। ঐদিন পূজা উপলক্ষে চলে খাদ্য-খাবারে মহাধুম। বাড়ীর বয়জ্যেষ্ঠ মহিলারা উপবাস থেকে এই পূজা করে। পূজায় লাগে একটি বাঁশের

ফুলের ডালা। ডালার মধ্যে সমস্ত রকম ফুল, ধান-দূর্বা ও ধূপধূনা থাকে। ডালা যেখানে বসে তার নীচে একটি পুকুর তৈরী করা হয়। ঐ পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয় একটি জীবিত মাছ। পুকুরের ঘাটে একটি ঘট বসানো থাকে তার উপরে থাকে বাঁশের কণ্ডি। কণ্ডির উপরে থাকে একটি শোলার ফুল। ঐ ফুলটিকে লক্ষ্য করে পূজা আরম্ভ হয়। পূজার সামনে একটি নতুন মাটির হাড়ির মধ্যে একটি জলন্ত প্রদীপ থাকে। 'জীমূত বাহন' পূজা উপলক্ষে সারারাত ধরে চলে সাধুয়ালা, খন, নর প্রভৃতি গান। এ ছাড়া, ঐদিন বহুরূপী সাজার পালা, কেউ বাঘের মুখোশ, ভাল্লুকের মুখোশ বা সং সেজে বেড়ায়। পূজা উপলক্ষে প্রত্যেককেই নারিকেল ফল খেতে দেওয়া হয়। এই পূজা পারম্পারিক ভাব ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যম। দলে দলে এদিন পাড়া-পড়শী এলে কোনও কোনও বাড়ীতে দৈ-চিড়া আবার কোথাও ভাত-ডাল তরিতরকারী খাওয়ানো হয়।

শারাৎ ঃ কার্তিক মাসে কালীপূজার অমাবস্যার চতুর্দশীতে 'শারাৎ' বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। কেউ কেউ নবান্নের দিনেও এই অনুষ্ঠান করে। মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই উৎসব। 'শারাৎ' পার্বনের জন্য গৃহস্বামী উপবাসে থাকেন। তিনি রান্না ঘরে গিয়ে কলাপাতার 'বাগুড়া' চৌদ্দ খণ্ডে ভাগ করে তার উপর কলাপাতায় চৌদ্দ-পুরুষের উদ্দেশ্যে আতপ চালের ভাত, মাসকলাইয়ের ডাল, চান্দা বা খোলসা অথবা চিংড়ি মাছের সাথে লাল ডাঁটা আর জলপাইয়ের ঘাট ভোগ দিয়ে তুলসীপাতা, তেলসিন্দুর ও ধূপধূনা প্রভৃতির মাধ্যমে পূজা করেন। পূজা শেষ হলে গৃহস্বামী রান্নাঘর থেকে বের হয়ে সাত-আট মিনিট রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। পরে, পূজার উপচার সমস্ত জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুরু হয় খাদ্য খাবারের পর্ব, এছাড়া চৈত্র সংক্রান্তিতে কেউ কেউ 'আমশারৎ' অর্থাৎ গাছ থেকে আম পেড়ে এনে পিণ্ডি সাজিয়ে মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আম শ্রাদ্ধের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

গ্রামীন লোক মানত

উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে পোড়া মাটির তৈরী ঘোড়া ও হাতি দিয়ে দেবদেবীদের পূজা দেবার প্রচলন রয়েছে। পোড়া মাটির ঘোড়া দিয়ে পীরকে শ্রদ্ধা জানানো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মাধ্যম। তাই এই ঘোড়াকে বলা হয় মানতের ঘোড়া। রাজবংশী সমাজের দেশী সম্প্রদায় ভুক্ত অধিবাসীরা এই শিল্পের কাজে নিযুক্ত।

ক্ষানিশপীর, জিনভুপীর, সোনিয়াপীর, সত্যপীর, ঘোড়াপীর, পীর আতাউল্লা, পীর স্থলতানশাহ, পীর হাবাখাড়ীর, পীর বাহার উদ্দীন প্রভৃতি পীরকে এই ঘোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া, মহারাজা, দোগা ও মিত্র পূজায় ভক্তরা হাতি দিয়ে দেবদেবীর পূজা দেন। গর্জাভিটায় যারা বাড়ী করেন ঐ গৃহের ভেতর একটি মাটির হাতিকে নিত্যই পূজা করতে দেখা যায়।

পীর সাহেবের অতি প্রিয় বাহন ঘোড়া। তাই, মানুষের বিশ্বাস যে, পীর সাহেবেব অতি প্রিয়বস্তু ঘোড়া দান করলেই তাদের আপদ বিপদ নাশ হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের দেশীপলি, কোচ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ও মুসলমান সম্প্রদায় ঘোড়ার মূর্তি উপহার দিয়ে পীর সাহেবকে খুশী করেন।

এছাড়া রয়েছে ঢেলপীর, ন্যাকড়া বা কানীপীরের মানত। বট অশ্বত্থের তলায় ঢিল ছুঁড়ে মানত করা গ্রামীন লোক জীবনে বংশপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। 'আরণ্যক জগতে বট ও অশ্বত্থ হলো বৃহত্তম বনস্পতি। আবহাওয়ার দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বট ও অশ্বত্থের ছায়া যেন গ্রামীন মানুষের শান্তির আশ্রয় স্থল। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা সকলেরই কাম্য। আবার ঝড় বাদল বট অশ্বত্থ গাছের বড় শত্রু। এই বিরাট বনস্পতির মাথা খুব ভারী, তারপর এর গোড়ায় যদি বেশী মাটি না থাকে, তবে সামান্য ঝড় বাদলেই গোড়া আলগা হলে মাথার ভারে গাছটি উল্টে পড়ে যায়। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে গোড়ায় বেশী করে মাটি দিয়ে উঁচু বেদীর মত তৈরী করতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া শ্রমসাধ্য কাজ। তাকে যদি পীররূপে ভাবা যায় তবে তার গোড়ায় মাটি দেয়াটা ধর্মের পবিত্র অঙ্গরূপেই গন্য হয় এবং সে ধর্মের কাজ করতে লোক এগিয়ে

আসে। এই পীররূপী বট-অশ্বত্থের পূজোর নৈবেদ্য কি? তা হলো ঢিল মাটি।' গ্রামীন মানুষের বিশ্বাস দূর থেকে ঢিল মেরে গাছের গোড়ায় ফেলে দিলেই সমস্ত মনসকামনা পূণ্য হয়।

এছাড়াও জীবনের মঙ্গল কামনার জন্য গ্রামীন লোকজীবনে প্রাচীনবট, অশ্বত্থ, আম বা শ্যাওড়া গাছের নীচু ডালে কাপড়ের ন্যাকড়া বা শোলার ফুল লাগিয়ে মানত করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। মানুষের বিশ্বাস বট, অশ্বত্থ, আম বা শ্যাওড়া গাছের ডালে ন্যাকড়া বা শোলার ফুল লাগিয়ে দিলে পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সমস্ত আপদ বিপদ নাশ হয়ে যায়।

লৌকিক প্রথা

বন্ধু সম্পর্কিত প্রথা

বন্ধু সম্পর্কিত প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজে পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ-প্রথায় এদেরই সমাজের 'কারুয়া' বা 'ঘটক' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এর কাজ হ'ল দুই অচেনা ও অজানার মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও নিবিড় একাত্মতাবোধের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। বন্ধু সম্পর্কিত প্রথা বলতে ছেলে ছেলে বন্ধুত্ব, মেয়ে-মেয়ে বন্ধুত্ব, নামে নামে বন্ধুত্ব, অভিভাবকে অভিভাবকে বন্ধুত্ব, অভিভাবিকা অভিভাবিকার বন্ধুত্ব বোঝায়।

বন্ধুআলা : বিবাহ পদ্ধতির মতই 'বন্ধুআলা' প্রথায় একজন কারুয়া বা ঘটক এক পরিবারের ছেলের সাথে অন্য পরিবারের ছেলের বন্ধুত্বের জন্য উভয় পরিবারের মতামত ও সম্মতি নিয়ে দিনক্ষণ স্থির করেন। কার ছেলে কোন পরিবারে আগে যাবে 'কারুয়া' তা আগে থেকেই ঠিক করে দেবার পর 'বন্ধুআলা'র জন্য উভয় পরিবারে আনন্দ উৎসব শুরু হয়। বন্ধুত্বের জন্য যে পক্ষ আগে যাবে—তার সঙ্গে যাবে পাত্রের অভিভাবক, আত্মীয় কুটুম, পাড়া-পড়শী এবং কারুয়া। সব মিলে পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের মত। নির্দিষ্ট দিনে ঢাক-ঢোল-কাঁশ-বাঁশী বাজিয়ে পাল্কিতে চড়ে পাত্রকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্ধুআলার উদ্দেশ্যে। ঐদিন নতুন বন্ধুর বাড়ীতে পাত্রের অভিভাবকরা সাথে করে নিয়ে যান দই-মিষ্টি-মাছ-নতুন কাপড়, ষোল গণ্ডা পান ও সুপারী।

নতুন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হলে উভয় পক্ষের অভিভাবকমণ্ডলী ও অন্যান্যদের সাথে প্রথমে কুশল বিনিময় হয়। পরে, পাত্রের সঙ্গে আনা পান ও সুপারীগুলি পাত্রের অভিভাবক পক্ষের একজন ঐ বাড়ীর তুলসীবেদীতে ছুঁইয়ে আনেন। পান ও সুপারীগুলি তুলসীবেদীতে ছুঁইয়ে আনার পর শুরু হয় 'চরণসেবা' পর্ব। 'চরণসেবা' পর্বে অনুজদের হাত-পা ধোবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অগ্রজদের প্রত্যেককেই একটি কাঁসার থালার উপরে প্রথমে ডান পা জল দিয়ে ধুইয়ে মুছে দেয়, পরে বাম পা। অগ্রজ মেয়ে অতিথি হলে প্রথমে বাম পা ও পরে ডান পা ঐ থালার উপর রেখে জলে ধুইয়ে মুছে দেয়। এরপর অপর একজন নতুন অতিথিদের মুখ ধোওয়ার জন্য এক গ্লাস করে জল

দেন। এই ভাবে মুখ ধোওয়া শেষ হলে 'চরণসেবা' পর্ব শেষ হয় ও জল-খাবার পর্ব শুরু হয়। মুড়ি-চিড়া-দই-মিষ্টি প্রভৃতি দিয়ে জলখাবার পর্ব শুরু ও শেষ হয়।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হলে কারুয়া বা ঘটক উভয় পক্ষের অভিভাবক, আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীদের সামনে দুইপক্ষের পাত্রকে তুলসীবেদীর সামনে দু'টি পিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। আগে থেকে দুই বন্ধুর কেউ যাতে মুখ দেখতে না পারে সেজন্য দু'জনের মাঝখান দিয়ে 'বিছানা' বা 'পর্দা' দেওয়া হয়। দুই বন্ধুর দুইপাশে থাকে দু'টি ডালা। ডালার মধ্যে থাকে একটি করে নতুন ধুতি, একটি করে পান ও সুপারী ও একটি করে টাকা। এছাড়া থাকে একটি মাটির ঘট, ধান-দূর্বা ও পঞ্চশস্য। এ-সময় বন্ধু পক্ষের সঙ্গে আনা পান-সুপারী যে অভিভাবকের কাছে থাকে, প্রথমে ঐ অভিভাবক উপস্থিত সকলের সামনে অন্যপক্ষের পাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন—

আচ্ছা বাবা, তুমি কি জন্য এখানে দাঁড়িয়েছ ?

পাত্র উত্তর দেয় ঃ বন্ধু পুছার (পোষা) জন্য।

অভিভাবক তখন ঘোষণা করেন যে—অমুকের ছেলে অমুকের সাথে বন্ধুত্ব করবে। এভাবে পুনরায় ঐ অভিভাবক উপস্থিত সকলের সামনে প্রশ্ন করেন—

তুমি যাকে বন্ধু করছ, তাকে কি ইহকাল—পরকালের জন্য বন্ধু পুছবে, না এককালের জন্য ?

পাত্র উত্তর দেয় ঃ ইহকাল ও পরকালের জন্য।

পুনরায় প্রশ্ন ঃ বন্ধু যদি তোমার পাঁচ'শ টাকা ক্ষতি করে দেয় তখন তুমি কি করবে ?

উত্তর ঃ আমি মাপ দেবো।

পুনরায় প্রশ্ন ঃ তুমি যে এই কথাগুলি বললে তার সাক্ষী কে ?

উত্তর ঃ আমার সাক্ষী দশজন। উপরে চন্দ্র-সূর্য্য।

উভয় তরফের অভিভাবকবৃন্দ পরস্পরের মধ্যে এ-ধরনের প্রশ্ন করলে উভয় বন্ধুই একই উত্তর দেয়। দশজনের কেউ মরবে—কেউ বাঁচবে—তাই সবাইকে সাক্ষী রেখে ডালা বদল পর্ব শুরু হয়। ডালা বদলের সময় উভয় পক্ষেরই আত্মীয়-কুটুম ও প্রতিবেশীরা একজন একজন করে প্রত্যেকেই পর্দার নীচ থেকে দুই বন্ধুর মধ্যে পরস্পর ডালা-বদল করেন। পরে যার বাড়ীতে অনুষ্ঠান

হচ্ছে ও যার সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে সেই নতুন বন্ধু প্রথমে অপর নতুন বন্ধুকে পর্দার উপর দিয়ে ডালা দেয় পরে অন্য বন্ধু পর্দার নীচের দিক দিয়ে অপর নতুন বন্ধুর কাছে ডালা-বদল করে। এভাবে ডালা-বদলের পর বিছানা বা পর্দাটি উভয়েরই সামনে থেকে তুলে নেওয়া হলে দুই বন্ধু উভয়েই উভয়কে আলিঙ্গন করে ও অভিভাবকদের ভক্তি করে। ঐদিন মাছ, বিভিন্ন পদের তাঁর-তরকারী, ভাজা প্রভৃতি রান্না হয়। পরে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শুরু হয়।

এরপর অষ্টমঙ্গলা পর্ব। আটদিন পরে নতুন বন্ধু অপর নতুন বন্ধুর বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ পায়। এ-সময় নতুন বন্ধুর বাড়ীতে যাবার জন্য 'সাইঙ্' সাজানো হয়। 'সাইঙ্' হচ্ছে একটি দশ-বার হাত লম্বা বাঁশ। বাঁশটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। বাঁশের অগ্র ও পশ্চাতাংশের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে এক কাঁধি মধুয়া কলা, এক কাঁধি মানিক কলা, চার হাঁড়ি দই, বড় হাঁড়ির দুই হাঁড়ি মুড়কী, বিভিন্ন ধরনের ফল, পান-সুপারী ও একটি টাকা প্রভৃতি ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। ঢাক-ঢোল-কাঁশি-বাঁশী বাজিয়ে পাল্কিতে চড়ে বন্ধু এবার তার নতুন বন্ধুর বাড়ীতে 'সাইঙ্' নিয়ে রওনা হয়। 'বন্ধুআলা' অনুষ্ঠানে যারা সাক্ষী থাকেন তাদের প্রত্যেকেই এবং বন্ধুর অভিভাবক ও আত্মীয় কুটুমেরাও সেদিন নতুন বন্ধুর বাড়ীতে পাত্রের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন। ঐদিন খাদ্য-খাবারের ধুমধাম চলে। 'বন্ধুআলা' উৎসবের মাত্রা স্থির হয় সামর্থ্য অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে জানাই যে, 'বন্ধুআলা' গানের সাথে 'বন্ধুআলা' প্রথার কোনও মিল নেই। এ-প্রথাতে গানের কোনও প্রচলন নেই। আর 'সাইঙ্' হচ্ছে এ সমাজেরই খাদ্যপ্রীতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক। মেয়েদের মধ্যেও 'বন্ধুআলা' রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ-রীতির নিয়ম একই রকম।

সোংরা ও সোংরী: নতুন দুই বন্ধুর অভিভাবকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠার জন্য 'সোংরা' প্রথার প্রচলন। 'সোংরী' হ'ল নতুন দুই বন্ধুর অভিভাবিকার সাথে বন্ধুত্ব। 'বন্ধুআলা' অনুষ্ঠানের মতই 'সোংরা' ও 'সোংরী' প্রথার নিয়মবিধি। তবে এ-প্রথায় ডালা-বদল পর্ব নেই। তুলসী-বেদীর সামনে ষোলগন্ডা বা বারগন্ডা পান ও সুপারীসহ একটি থালার মধ্যে রেখে দিয়ে নতুন বন্ধুদ্বয়ের অভিভাবকরা মুখোমুখি দু'টি পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে কাঁধ এগিয়ে নিয়ে আলিঙ্গন জানান ও পরস্পর

পরস্পরকে হলুদ মাখিয়ে দেন। এভাবে আলিঙ্গন পর্ব শেষ হলে পরস্পর বন্ধুআলা প্রথার মত শপথ নেন। 'সোংরী' প্রথাতে ঐ একই ধরনের নিয়মবিধি পালিত হয়।

সইআলা ও মিস্তর: মেয়েদের ক্ষেত্রে নামে নামে মিললে 'সইআলা' গড়ে ওঠে। ছেলেদের ক্ষেত্রে নামে নামে মিললে মিস্তর বা 'মিতাআলা' অনুষ্ঠিত হয়। এ-প্রথার নিয়মবিধি 'বন্ধুআলা' প্রথার মত।

বিহায়-বিহানী: পুত্র বা কন্যার বিয়ে হওয়ার পর সম্পর্ক গাঢ়তর হওয়ার জন্য বিহায়-বিহানী রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথায় পাত্রপক্ষের অভিভাবক, আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীরা কন্যাপক্ষের অভিভাবকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এ প্রথায় তুলসী বেদীর সামনে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা পরস্পর মুখ করে দুটি পিঁড়িতে বসেন। উভয়েরই মাঝখান দিয়ে একটি 'বিছানা' বা 'পর্দা' দেওয়া হয়। এরপর, উভয় তরফ থেকে প্রশ্ন ও উত্তর পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয়। উভয়েরই দু'জন অগ্রজ প্রতিম পরস্পরকে প্রশ্ন করেন—

এখানে কি জন্য এসেছ?

উত্তর: বিহায়-বিহানী সম্পর্ক গাঢ়তর করার জন্য। এভাবে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হলে পাত্র-পক্ষের অভিভাবক পাত্রীপক্ষের অভিভাবককে একটি টাকা পর্দার উপর দিয়ে দেন। বিনিময়ে পাত্রী পক্ষের অভিভাবক একটি টাকা পাত্র-পক্ষের অভিভাবককে পর্দার নীচে দিয়ে দেন। টাকা দেবার অনুষ্ঠান শেষ হলে 'পর্দা' বা 'বিছানা' উভয়েরই মাঝখান থেকে সরিয়ে নেবার পর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং উভয়েই উভয়কেই হলুদ মাখিয়ে দেন। 'বিহানী' সম্পর্কের জন্য স্বতন্ত্র কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

বিবাহ সম্পর্কিত প্রথা

বিয়ের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন রয়েছে। এসব প্রথাতে 'কারুয়া' বা 'ঘটক'কে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এসব প্রথা উপলক্ষে পান ও সুপারী শুভ ইঙ্গিতের প্রতীক রূপে ব্যবহার হয়। সমাজের মহত বা প্রধানকে এ সব প্রথায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

শুভের পান: পান শুভজিনিসের প্রতীক। বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পানের ব্যবহার ও পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিবাহ

অনুষ্ঠানে 'শুভের পান' নামে একটি প্রথার প্রচলন এদের সমাজে এখনও সাড়ম্বরে পালিত হয়। পাত্র পক্ষের অভিভাবকরা কন্যা দেখে আসার পর কারুয়া বা ঘটক মারফৎ কন্যার বাড়ীতে শুভের পান পাঠান। কন্যা দেখে আসার পর কন্যাকে পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক না কেন রীতি অনুযায়ী কন্যার অভিভাবকদের কাছে পাত্র পক্ষের অভিভাবকরা 'শুভের পান' পাঠাবেন। কারুয়া ঐ পান নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং কন্যার আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীদের সামনে ঐ পান তখন 'শুভের পান' রূপে অভিভাবকের হাতে তুলে দেন। কন্যার অভিভাবকরা ঐ পান গ্রহণ করার পর তার থেকে দু'টি পান ও সুপারী কারুয়ার হাতে দেন পাত্র-পক্ষের অভিভাবকদের কাছে দেবার জন্য। বাকী পানগুলি পরে কন্যার বাড়ীর অভিভাবক আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীদের মধ্যে খাবার জন্য বণ্টিত হয়।

কথাবার্তার পান : হয়ত পাত্রের বাবার মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে, তাই কন্যা পক্ষের মতামত কি জানার জন্য কারুয়া মারফৎ কন্যা পক্ষের বাড়ীতে কথাবার্তার পান পাঠান। পাত্রের অভিভাবক কারুয়ার হাতে ঐদিন একহাঁড়ি মিষ্টি ও এক'শটি পান ও সুপারী দিয়ে কন্যার বাড়ীতে কারুয়াকে পাঠান। কারুয়ার সাথে থাকে ঐ দিন পাত্র পক্ষের একজন অনজ প্রতিম আত্মীয়। কারুয়া ঐ পান নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তুলসীবেদীর সামনে ঐ পানগুলি রাখেন। পরে ঐ পানগুলি থেকে কয়েকটি পান ও সুপারী গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে বাকী পানগুলি একটি পানের ডালার মধ্যে বা একখণ্ড কলাপাতার উপর রাখেন। কারুয়া তখন ঐ পানের ডালা দিয়ে দশজনের সামনে ভক্তি দেন। সেই সময় কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম ও সমাজের সবাই একত্রিত হয়ে বলেন যে, ঐ পানগুলি কিসের? কারুয়া উত্তর দেন যে, পানগুলি 'কথাবার্তার পান'। অমুকের ছেলের সাথে অমুখের মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধের জন্য। এরপর কথাবার্তা শুরু হয়। কথাবার্তার শেষে ঐ পানগুলি আত্মীয় কুটুম ও সমাজের দশজনের মধ্যে খাবার জন্য বণ্টিত হয়।

কন্যাদর্শনী : পাত্র দেখে কন্যার বাড়ীর আত্মীয় কুটুম প্রত্যেকেরই পছন্দ হয়েছে। শুধু মেয়ের মার পছন্দ হয় নি, অথবা মেয়ের মার পছন্দ হয়েছে, হয়ত মেয়ের বাবার পছন্দ হয় নি। তখন মন ভোলানোর জন্য কারুয়া মারফৎ কন্যাপক্ষ থেকে পাত্রপক্ষের কাছে ভাল ভাল মিষ্টি, ক্ষীর, বড় ডিময়ালা

মাছ প্রভৃতি খাবার আবেদন জানান। এ ব্যাপারে পাত্রপক্ষের কিনে দেওয়া বড় ডিময়ালা মাছ, মিষ্টি, ক্ষীর দই প্রভৃতি নিয়ে পাত্রের আত্মীয় কুটুম ও কারুয়া সহ কন্যাপক্ষের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ঐ দিন কন্যাপক্ষের বাড়ীতে খাদ্যখাবারে চলে ধুমধাম। পাত্র পক্ষের সঙ্গে আনা খাদ্যখাবার খাওয়ার পর কন্যা পক্ষের অভিভাবকরা জানায় যে, সম্বন্ধ এখানেই হবে। পাত্র পক্ষের কাছে যা যা খাবার চেয়েছি তার সবই পেয়েছি। এত খাবার পর সম্বন্ধ যদি না হয় লোকে কি বলবে? এ অনুষ্ঠানকেই কন্যা দর্শনী বলে।

দিনধরা ঃ বিয়ের দিন তারিখের জন্য 'দিনধরা' প্রথার প্রচলন রয়েছে। কারুয়া সহ পাত্র পক্ষের আত্মীয়স্বজন দই, মিষ্টি, মাছ প্রভৃতি নিয়ে পাত্রীপক্ষের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ঐ দিন বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হবার পর কন্যা ও বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন কতজন রয়েছে এবং বিয়ে উপলক্ষে কতজন নিমন্ত্রিত হবে উভয় পক্ষের তরফ থেকে সেই ভাবে পান ও সুপারী দেবার আহ্বান পর্ব শুরু হয়। এই পর্ব শেষ হলে উভয় পক্ষই উভয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যানুযায়ী পান ও সুপারী পাঠান। এই পান ও সুপারী দিয়ে উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘর সমাজ ও পরসমাজকে বিয়ের নিমন্ত্রন জানায়।

দড়হ ঃ বিয়ে পাকাপাকি করার সময় 'দড়হ' প্রথার প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ একে 'দরগা' বা 'পানচিনি' বলে। ঐ দিন কন্যার বাড়ীতে প্রত্যেকেই নবসাজে সজ্জিত হন। নতুন আত্মীয় কুটুমেরা এলে পা ধোয়ার ব্যবস্থার পর চিড়া-দুধ-দই-মুড়ি-মিষ্টি প্রভৃতি জল খাবার দেন। জল-খাবার পর্ব শেষ হলে প্রত্যেকেই ঘরে এসে বসেন। কিছুক্ষণ পর কন্যাকে নতুন কুটুমদের ঘরে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। নতুন কুটুমদের একজন তখন কন্যার হাতে এক হাঁড়ি মিষ্টি দেন এবং অন্যান্যরা টাকা দেন। নতুন কুটুমদের ভক্তি করে কন্যা ঘরে চলে গেলে বিবাহ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার পর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শুরু হয়। 'দড়হ' উপলক্ষে কন্যার বাড়ীতে গান গাওয়া হয়। পাত্রের নিন্দা করে মুখে মুখে গান তৈরী হয় এবং ঐ গান করেন কন্যার মাসী পিসী ও অন্যান্যরা।

খুদানি ঃ 'দড়হ' প্রথার পর 'খুদানি' শুরু হয়। রীতি অনুযায়ী 'খুদানি' করতে কন্যার বাড়ীতে পাত্র-পক্ষের অভিভাবিকারা আসেন। ঐ দিন পাত্রের মাসী-পিসী, পাড়া-পড়শী ও বোনেরা সহ কন্যার বাড়ীতে

এলে অতিথিদের জলখাবার পর্ব শেষ হবার পর 'খুদানি' অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাত্রপক্ষের অভিভাবিকারা ঘরের মধ্যে গোল করে বসেন। ঐ বৃত্তের মধ্যে কন্যাকে এনে দাঁড় করানো হয়। পাত্রের অভিভাবিকাদের মধ্যে একজন তখন কন্যাকে যে কোন একটি গহনা পরিয়ে দেন এবং ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। অন্যান্যরাও ধান-দূর্বা দিয়ে কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। পরে অভিভাবিকাদের মধ্যে একজন কন্যার মাথায় তেল দিয়ে আঁচড়িয়ে দেন। এইভাবে 'খুদানি' অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শুরু হয়। 'খুদানি' অনুষ্ঠানেও পাত্রপক্ষের নিন্দা করে পাত্রী পক্ষের আত্মীয়রা গান করেন।

জিজ্ঞাসপত্র ঃ বিয়ে হবার চারদিন কি পাঁচদিন বাকী আছে। এরই মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিন দেখে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের উভয়েই নিজ নিজ সমাজের লোকজনকে ডেকে নিজ নিজ বাড়ীতে 'জিজ্ঞাসপত্র' অনুষ্ঠান করেন। ঐদিন উভয়েরই বাড়ীতে উভয় সমাজের নিজ নিজ লোকজন সহ মধ্যাহ্নে খাদ্যখাবারে ধুমধাম চলে।

'জিজ্ঞাসপত্র' অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভিভাবকরা নিয়মানুসারে একশটি পান ও সুপারীসহ ডালা সাজিয়ে দশের সামজে ভক্তি দেন। সমাজের লোকজন তখন জানান যে—এই ডালাটি কিসের? উত্তর দেন, এটি বিয়ের ডালা। অমুকের ছেলের সাথে অমুকের মেয়ের বিয়ে। এ বিয়েতে সমাজের কারও কোনও আপত্তি আছে কি? অভিভাবকরা এ ধরনের প্রশ্ন করেন। যদি কারও আপত্তি না থাকে তাহলে এ বিয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজই বহন করবেন। এ বিয়েতে সমাজের প্রত্যেকেই উপস্থিত থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের কাজ সম্পূর্ণ করবেন। এইভাবে 'জিজ্ঞাসপত্র' অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের পর বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বাড়ীতে জমিতে হালের কাজ বন্ধ থাকে। বিয়ে ছাড়াও শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সমাজের লোকজনকে ডেকে 'জিজ্ঞসপত্র' অনুষ্ঠিত হয়। 'জিজ্ঞসপত্র' অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সমাজের যদি কোনও ব্যক্তি মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকেন তাহলে সমাজের মহতের কাছে ধরে এনে তার বিচার করা হয়। বিচারে দোষী বলে গন্য হলে শাস্তিও হয়।

বাসরঘর বন্ধন ঃ একই সঙ্গে বসে একই থালায় আত্মীয় কুটুম নিয়ে খেতে

দেখা যায় 'বাসরঘর বঞ্চন' প্রথায়। সাজো বিয়ের শেষে বাসরঘরে নববিবাহিত দম্পতি প্রবেশ করলে 'বাসরঘর বঞ্চন' পর্ব শুরু হয়। 'বাসরঘর বঞ্চন' পর্বে বাসর ঘরে নতুন বরকে নিয়ে শালা-শালী সম্বন্ধির বউ প্রমুখ জনেরা একই থালায় একত্রিত হয়ে খান।

ঢাকুন ঃ বিয়ে হবার পর পাত্রপক্ষের বাড়ীতে 'ঢাকুন' প্রথার প্রচলন রয়েছে। 'ঢাকুন' অর্থ বৌ-ভাত। ঐ দিন নিমন্ত্রিত অতিথিমণ্ডলী খেতে বসলে প্রথমে নববধূ নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভাত সহ যা যা রান্না হয় সমস্তই প্রত্যেকেব পাতে দেন। এই পদ্ধতিকে 'ঢাকুন' বলে। 'ঢাকুন' হ'ল একটি বড় বাটি বা সরা। ঐ সরার মধ্যে যে সব জিনিস রান্না হয় তার সমস্তই মেখে নেন। পরে, নববধূ তার নিজের অনুজপ্রতিম বোন বা আত্মীয়কে নিয়ে ঐ 'ঢাকুন' থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করেন।

অভিভাবক সম্পর্কিত প্রথা

সমাজে কেউ হয়ত পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয় স্বজনহীন। জীবনে চলার পথে একজন অভিভাবক প্রয়োজন। অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য অভিভাবব সম্পর্কিত প্রথার প্রচলন রয়েছে।

বাপদায় বা ধরম বাপ বা ধরম মা ঃ দু'ধরনের ভাবনা থেকে রাজবংশী সমাজে বাপদায় বা ধরমদায় প্রথার প্রচলন হয়েছে। (এক) কারু হয়ত বাপ মা শৈশবে মারা গেছেন, সংসারে আত্মীয় কুটুম বলতে কেউ নেই। তাই তার ইচ্ছা ঐ সমাজের কোনও অগ্রজকে অভিভাবকরূপে ধরম-দায় বা ধরম-বাপ রূপে মেনে চলা। (দুই) কারু কাছে কেউ হয়ত ঋণ করেছে। ঋণের টাকা কিছুতেই শোধ করতে পারছে না, কোনও উপায়ও নেই। তাই ঋণ গৃহীতা— ঋণদাতা বা ঋণদাত্রীকে বাপদায় বা ধরমবাপ বা ধরম-মা বলে সম্বন্ধ করে ঋণের হাত থেকে মুক্ত হন।

এই প্রথাতে লোকাচারের পর্বটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি ধরমদায় নেন—তাকে ষোলগণ্ডা পান ও সুপারী, মাছ, মিষ্টি, দই, দুধ, কলা প্রভৃতি সহ কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে ধরমবাপ বা ধরম মার বাড়ীতে উপস্থিত হ'তে হয়। তুলসীবেদীর সামনে পান ও সুপারীগুলি একটি থালার মধ্যে রাখতে হয়। এবার ধরম-বাপ বা ধরম-মা ঐ তুলসী বেদীর

সামনে একটি পিঁড়িতে বসেন। যিনি ধরমদায় নিচ্ছেন তিনি ঐ পান সুপারীগুলি ধরম-বাপ বা ধরম-মার কাছে ভক্তি সহকারে এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করেন এবং বলেন যে, আজ থেকে আপনাকে বাপ-দায় বা মা-দায় দিলাম। আমার কেউ নেই, বাবা নেই মা নেই—আত্মীয় নেই—স্বজন নেই। আজ থেকে আপনারাই আমার সব। ঋণী ব্যক্তিও ঐ একই লোকাচার পালন করেন। অনুষ্ঠান পর্বের পরে ঋণ মকুবের কথা ধরম-বাপ বা ধরম-মার কাছে জানালে তা মাপ করে দেন। ধরম-মা প্রথায় মা-দায় নেবার পর ধরম-মা তখন নিজ সন্তানের মত ঐ ছেলেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে একটি নতুন বাটিতে দে—খৈ খাওয়ান। এইভাবে আটদিন পরে অষ্টমঙ্গলা হয়। অষ্টমঙ্গলার দিন যিনি ধরমদায় নিয়েছেন তিনি ধরম-বাপ বা ধরম-মাকে ডেকে এনে একটি নতুন কাপড় দেন এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যখাবার খাওয়ান।

খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রথা ঃ খাদ্যখাবারকে কেন্দ্র করে কিছু কিছ প্রথার প্রচলন রয়েছে। এসব প্রথায় খাদ্যখাবারের রুচিবোধ ও বিভিন্ন রকমের খাদ্যখাবারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিশুয়া ঃ 'বিশুয়া' খাদ্যখাবারের একটি অন্যতম প্রথা। 'বিশুয়া' অর্থ বিশ রকম পদের রান্না। চৈত্র সংক্রান্তির দিন 'বিশুয়া' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বছরের শেষ দিনটিতে যবের ছাতু দিয়ে ঠাকুর সেবা পর্ব শেষ হলে মধ্যাহ্নে যবের ছাতু গুলিয়ে মুড়ি-খৈ প্রভৃতি দিয়ে আহার পর্ব চলে। রাত্রিতে 'বিশুয়া' শুরু হয়। ভাজা-ডাল-মাছ বিভিন্ন পদের তরিতরকারী প্রভৃতি ২০ রকম পদের রান্না খাদ্যবস্তু দিয়ে প্রত্যেকেই ঐ দিন রাত্রিতে আহার করেন। লক্ষ্যনীয় যে, ঐদিন রাত্রে নিমপাতা ভাজা খেতেই হয় এবং পরিবারের প্রত্যেকেই ঐ দিন একত্রে বসে খান। বছরের শেষে ভাল খাওযা এরই প্রতীকরূপে বিশুয়া প্রথার প্রচলন। ঐ দিন রাত্রিতে রান্না করা ভাত জল দিয়ে রেখে—পরের দিন সকালে অর্থাৎ ১লা বৈশাখের দিনে ঐ জল দেওয়া ভাত (পান্তা ভাত) বাড়ীর প্রত্যেককেই খেতে হয়। এদের বিশ্বাস যে, পুরনো বছরের ভাত খেতে পাবে। এই বিশ্বাস থেকে পুরনো বছরের খাদ্য-খাবারের ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্র নতুন বছরে অটুট রাখার জন্য 'আগের সালের ভাত পরের সালে' খাওয়ার নিয়ম এদের সমাজে একটি

প্রথায় দাঁড়িয়েছে। এবং এই প্রথা এখনও সযত্নে পালিত হয়ে আসছে।

শেষের ভাত খাওয়া ঃ কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভাত দেবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। মৃতদেহ বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার সময় মৃতদেহের সাথে একটি ছোট মাটির হাঁড়িতে 'পান্তাভাত' অথবা 'গরমভাত' নিয়ে যায়। মৃতের দাহ কাজ শেষ হবার পর চিতা পরিষ্কার করে—মৃতের যেদিকে মাথাটি ছিল—সেখানে একটি 'বিন্নার গাছ' দিয়ে মৃত দেহের সাথে আনা একটি বড় মাটির হাঁড়ি জল দিয়ে বসিয়ে দেয়। পরে ঐ হাঁড়ির উত্তর কোনে সঙ্গে আনা ঐ ভাতের হাঁড়িটি বসায়। যে ব্যক্তি মৃতের মুখে আগুন দিয়েছিল, সেই ব্যক্তি উত্তর মুখ হয়ে পিছন দিক দিয়ে একটি 'কইচা'র সাহায্যে হাঁড়িটি ফুটো করে দেয়, যাতে বড় হাঁড়ির জল ভাতের হাঁড়ির মুখে পড়ে! পরে বলে,

'দানাপানি তামাম খা
ছিরি কল্লার হাট যা'

এইভাবে মৃতের জন্য 'শেষের ভাত খাওয়া' অনুষ্ঠান পর্বটি শেষ হয়। প্রসঙ্গত জানাই, এদের সমাজে যাঁরা সাধক ব্যক্তি অথবা খুবই গরীব তাদের মধ্যে মৃতদেহকে সমাধি দিতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে 'শেষের ভাত খাওয়া' অনুষ্ঠানটির নিয়মের কোনও হেরফর হয় না।

আশ্বিনের খোক্রা ভাত কার্ত্তিকে ঃ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন রাত্রে 'খোকরা ভাত' অর্থাৎ আতপ চালের ভাত রান্না হয়। সেইভাত ঐ দিন রাত্রে এবং পরদিন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের পয়লা তারিখে সকালে খেতে হয়। ঘিয়ের রান্না তরি-তরকারী অথবা শুধু ঘি বা আলুসিদ্ধ দিয়ে 'খোক্রা ভাত' খাবার রীতি। কার্ত্তিক মাস ধর্মমাস বলে ঐদিন সকালে 'খোকরা ভাত' খেয়ে ধর্মমাসের ব্রত পালিত হয়। অনেকেই সারা কার্ত্তিক জুড়ে নিরামিষ আহার করেন।

পৌষাল ঃ পৌষ মাসের প্রথমদিকে পর পর তিনদিন একবেলা করে আতপ চালের ভাত খেতে অনেককেই দেখা যায়। এর কারণ হল, সারাবছর খেটে যে ধান উৎপাদন করেছে তাকেই শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ঐ নিয়ম পালিত হয়। একে পৌষাল বলে। ধর্মরক্ষা ও শরীর স্বাস্থ্য সুস্থরাখার জন্যেও কেউ কেউ এধরনের প্রথা পালন করেন। এছাড়া ভাদ্র মাসে ভাদই ধান উঠলে ভাদই

চালের গুঁড়ো করে পিঠা খাবার নিয়ম পালন করতে দেখা যায়। ভাদই চালের তৈরী এই পিঠা খেলে এদের ধারণা যে, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা চালু রয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে হাল বাইতে বাইতে 'বুকত্ ভিড়া ধরে' বা 'বুকত ঘোসি হচে' অর্থাৎ বুকটা শক্ত হয়ে গেছে। বুকের এই শক্ত ভাব বা ক্লান্তি দূর করার জন্যই ভাদই চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী পিঠা খাবার প্রচলন রয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই যে, পারিবারিক প্রথানুযায়ী ভাদ্র মাসে, ভাই বোনের বাড়ীতে যায় না। যদি কোন কারণ বশতঃ যেতে হয়—কোনও কিছু সেখানে খায় না। যদি নিতান্তই কিছু খেতে হয় তাহলে, দেশীয় রাই সরিষা বেটে তা দিয়ে চিড়া খেতে দেওয়া হয়।

অন্যকে কিছু দিতে হলে কিছু খেতে হয়ঃ 'অন্যকে কিছু দিতে হলে কিছু খেতে হয়' এরকম একটি রীতি এদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। যদি কেউ কারুর কাছে প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস নেন, এমনকি টাকাও যদি ধার নেন, তাহলে, যে ব্যক্তি দিচ্ছেন—তিনি, কিছু খেয়ে নিয়ে তবেই তাকে সাহায্য করেন। কোনও ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার সময় যে ব্যক্তি ভিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি কিছু মুখে দিয়ে তবেই ভিক্ষা দেন। অর্থাৎ এদের সমাজে খালি মুখে কেউ কারুকে কোনও কিছু দেয় না। মুড়ি-চিড়া-খৈ বা ভাত মুখে দিয়ে তবেই অন্যকে কিছু দেবার নিয়ম।

বিবিধ আচরণ মূলক প্রথা

তীর্থপর্ব ঃ 'তীর্থপব' উপলক্ষে এদের সমাজে খাদ্যখাবারে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবারের কেউ তীর্থে গেলে আগের দিন আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রন করে মধ্যাহ্নে সেবা দেন এবং ঐদিন যিনি তীর্থে যাবেন তিনি আত্মীয় কুটুমের সাথে ভালমন্দ গল্প করে সময় কাটান। পরের দিন বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার আগে ঐ ব্যক্তিকে বাড়ির মহিলারা তেল ও হলুদ মাখিয়ে দেন। বাড়ীতে ঐদিন নিরামিষ রান্না হয়। কিছুদিন পর তীর্থ থেকে ফিরে এলে ঐ ব্যক্তি নাপিত দিয়ে শুদ্ধ হয়ে বাড়ীর সামনে কোনও জলাশয় থেকে স্নান করে ঘরে ফেরেন। যেহেতু তীর্থ থেকে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন তাই তিনি পুনরায় একদিন আত্মীয় কুটুম ও প্রতিবেশীদের ডেকে এনে মধ্যাহ্নে সেবা দেন। ঐদিনও নিরামিষ রান্না হয়।

সাধখিলান ঃ পাঁচ মাস অথবা সাত মাসের গর্ভবতী মহিলার সাধ দেওয়ার রীতি এদেরও সমাজে প্রচলিত রয়েছে। একবারই এদের মধ্যে সাধ দেবার নিয়ম। সাধের দিন পাড়া-পড়শী ও আত্মীয় কুটুমদের ডেকে এনে 'সাধ খিলান' পর্ব শুরু হয়। খিলান অর্থ খাওয়ানো। ঐদিন গর্ভবতী মহিলাকে একটি নতুন কাপড় পরিয়ে ঘরে বা বারান্দায় বসানো হয়। একটি নতুন বাটিতে দুধের ক্ষীর, নাড়ু ও একটি পাত্রে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলারি রাখা হয়। মা ও পরিবারের অন্যান্যরা বা পাড়া-পড়শী কাকীমা-মাসীমা-পিসীমা এরাই ঐ গর্ভবতী মহিলাকে দুধের ক্ষীর-নাড়ু ও অন্যান্য ফল-ফলারি খাইয়ে দেন। 'সাধ খিলান' অনুষ্ঠানে আত্মীয় কুটুম ও পাড়া-পড়শীদের নিমন্ত্রন করে খাওয়ানো হয়।

গৃহপ্রবেশ ঃ 'গৃহ প্রবেশ' উপলক্ষ্যে জ্ঞাতিকুটুম ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রিত হ'তে দেখা যায়। ঐ দিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। 'গৃহপ্রবেশ' পর্বে প্রথমে জলপূর্ণ কলসী নিয়ে পাঁচজন মহিলা গৃহের ভেতরে প্রবেশ করেন পরে অন্যান্যরা। এরপর পূজার প্রসাদ ও বাড়ীতে যা যা রান্না হয় সমস্ত কিছু অল্প করে নিয়ে ঐ ঘরের চার কোনে প্রসাদরূপে দেওয়া হয়। নিয়মানুসারে ঐ দিন মিষ্টান্ন তৈরী করতে হয়।

ক্ষীরচাকানো ঃ নবজাত সন্তানের মুখে ভাত দেবার সময় 'ক্ষীর চাকানো' অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভাগীদার আত্মীয়-কুটুম পাড়া-পড়শীরা এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন। ঐদিন দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরী করা হয়। প্রথমে সন্তানের মামা নবজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে মুখে ক্ষীর দেন পরে অন্যান্যরা। এই পর্ব শেষ হলে নবজাত সন্তানকে পাল্কিতে চড়িয়ে ঢাক-ঢোল-কাঁশি-বাঁশী বাজিয়ে পাড়ার চতুর্দিকে এবং পাড়ায় অবস্থিত দেবালয় গুলিতে ঘোরানো হয়। এরপর শুরু হয় নামকরণ পর্ব। এই পর্বে পাঁচ টুকরো কাগজে পছন্দ মত নাম লিখে সারিবন্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। পরে ঐ কাগজের টুকরো গুলির পাশে পাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। প্রদীপ গুলি আপনা-আপনি জ্বলতে জ্বলতে যে প্রদীপটি নিভে যায় অর্থাৎ পাঁচটি প্রদীপের মধ্যে চারটিই নিভে গেছে একটি হয়ত বাকী আছে, ঐ একটির পাশে কাগজে যে নাম লেখা আছে—জাতকের নামকরণ সে নামেই রাখা হয়। এই অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব দু'দিন ধরে চলে।

পোষপুত্র ঃ 'পোষপুত্র' অর্থ পালিত পুত্র। কারু হয়ত সন্তান নেই, অন্যের সন্তান নিয়ে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করেন। একটি শুভ দিন স্থির করে সন্তান-গ্রহনের জন্য পোষপুত্র বা পালিতপুত্র অনুষ্ঠান শুরু হয়। পোষপুত্র অনুষ্ঠানে যে মহিলা পুত্র গ্রহণ করেন তাকে প্রসূতির মতই ঐ সন্তানকে নিয়ে পাঁচদিন আঁতুড় ঘরে থাকতে হয় এবং আঁতুড়ের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। পাঁচদিন পর আঁতুড় শেষ হলে নাপিত দিয়ে শুদ্ধ হয়ে 'কুঁই ছোয়া' (কুঁই ছোয়া পুজার অর্থ কুয়ো বা ইন্দারা ছুঁইয়ে পুজো দেওয়া। পাঁচজন মহিলা একত্রিত হয়ে এ পুজো করেন) পুজো দিয়ে আঁতুড় পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়। ঐদিন পাড়ার পাঁচজন মহিলা সহ আত্মীয় কুটুমেরা নিমন্ত্রিত হন।

পূর্ণদীক্ষা ঃ কুলগুরু-র কাছে 'পূর্ণদীক্ষা' নেবার সময় আত্মীয় কুটুমদের নিমন্ত্রিত হ'তে দেখা যায়। যিনি পূর্ণদীক্ষা নেন তিনি তুলসী বেদীর সামনে একটি পিঁড়িতে পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। কুলগুরু বসেন পশ্চিমদিকে মুখ করে। পূর্ণদীক্ষার জন্য একটি নতুন কাপড় ও দুধ, মধুয়াকলা, ঘি-মধু-পঞ্চশস্য, মাটিরঘট, আম্রপল্লব, তুলসীপাতা, বেলপাতা প্রভৃতি উপাচার লাগে। কুলগুরু পূজাপর্ব শেষ করে ঐ নতুন কাপড়টি শিষ্যের মাথার উপর দিয়ে আচ্ছাদন দেন। পরে গোপনে মন্ত্র দেন। এভাবে পূর্ণদীক্ষা পর্ব শেষ হয়।

ভাদ্রকাটানি ও পৌষকাটানি ঃ বিবাহিত কন্যাদের বাপের বাড়ীতে 'ভাদ্রকাটানি ও পৌষকাটানি' প্রথার প্রচলন রয়েছে। শ্রাবণ মাসের শেষের দুই-একদিন থাকতে কন্যাকে আনতে কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুমেরা দই—চিড়া—মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে একদিন থাকার পর আত্মীয়-কুটুমেরা কন্যা নিয়ে পরদিন গৃহ অভিমুখে রওনা হন। ভাদ্রমাস শেষ হলে অনুরূপ ভাবে পাত্র পক্ষের লোক জনেরাও কন্যাকে আনার জন্য দই, চিড়া, মিষ্টি, মাছ প্রভৃতি নিয়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হন। পিত্রালয়ে থাকাকালীন কন্যার অভিভাবকরা ভাদ্র কাটানির শেষে মেয়ে ও জামাইয়ের জন্য নতুন কাপড় দেন।

'পৌষকাটানি' প্রথায় কন্যাদের অগ্রহায়ণ মাসের দুই একদিন থাকতে কন্যার অভিভাবকদের বাড়ীতে আনা হয়। কন্যার আত্মীয় কুটুমেরা দই-

চিড়া-মিষ্টি মাছ প্রভৃতি নিয়ে কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। 'পৌষ কাটানির শেষে কন্যার অভিভাবকরা মেয়ে ও জামাইয়ের জন্য নতুন লেপ ও তোষক দেন।

কুশদহন : কোনও জ্ঞাতি-কুটুম দীর্ঘদিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে—অথচ ফিরে আসেনি আত্মীয়-কুটুমেরাও তার কোনও সংবাদ জানে না। এ-অবস্থায় দীর্ঘদিন পর তার মৃত্যু-সংবাদ এসেছে। আত্মীয়- কুটুমেরাও এ সংবাদ পেয়ে খুবই শোকগ্রস্ত। তখন শুরু হয় 'কুশদহন পর্ব''। যে পরিবারে 'কুশদহন' অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে পরিবারের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের মহতকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ঐদিন ব্রাহ্মণ এসে যিনি মারা গেছেন তাকে স্মরণ করে কুশ দিয়ে একটি মানুষের মূর্তি গড়ান। মহত এসে অন্যান্যদের সাহায্যে মাক্‌লা বাঁশের মাচা তৈরী করেন। ঐ মাচার মধ্যে কুশের তৈরী মূর্তিটিকে শুইয়ে দেন। এরপর বাড়ীর মহিলারা ঐ মূর্তির উপর তেল ও হলুদ মেখে দেন। মৃতব্যক্তিকে যেভাবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক সেভাবে মূর্তিটিকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বড় ভাই হলে ছোট ভাই ঐ মূর্তিটিকে মুখাগ্নি করেন। ছোটভাই হলে তার সমসাময়িক ভাই অথবা জ্ঞাতি ভাইদের একজন আগুন দেন। 'কুশদহন' উপলক্ষ্যে খাদ্য-খাবারের কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। যতক্ষণ মৃতদেহ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ বাড়ীর আত্মীয়-কুটুম ও অন্যান্যরা মাছ-মাংস বাদে যা যা রান্না হয় সমস্ত কিছুই খায়। শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর ঐ বাড়ীতে কেউ আর ভাত খায় না। যে ব্যক্তি মুখাগ্নি করেন তিনি একটু কাঁচা আতপ চাল সামান্য চিনি দিয়ে খান। এরপর তে-রাত্রি পালিত হয়। তে-রাত্রির ৮ দিন পর পটুয়া-পিণ্ডি অনুষ্ঠিত হয়। পটুয়া-পিণ্ডি না হওয়া পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে রান্নায় তেল-হলুদ ও কোনও মশলাপাতি ব্যবহার হয় না। বাড়ীর লোকেরা ঐ কদিন জমিতে কোনও হাল দেয় না। কেউ যদি আত্মহত্যা করে 'তে-রাত্রি'তে ঐ ব্যক্তির স্মরণে কুশের মূর্তি তৈরী করে দাহ করা হয়।

আবহাওয়া ও পরিবেশগত প্রভাবে স্থানভেদে বিভিন্ন লৌকিক প্রথার নামকরণ ও পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথাকে কেন্দ্র করে যে লোকাচার পালিত হয় তার ধরন সর্বত্র একই রকম। এক্ষেত্রে নিয়মের কোনও হেরফের নেই। মূলতঃ ধনী-গরীব নির্বিশেষে এসব প্রথা পালিত হলেও

এক একটি প্রথাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবের মাত্রা স্থির হয় সামর্থ্যের উপর। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর বিভিন্ন প্রথার একদিন এদের সমাজে সামাজিক হৃদ্যতার গণ্ডী দিগন্ত জুড়ে প্রসারিত হত, এখন ক্রমশই তা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

গ্রামীন লোকগান

বন্ধুপাঁচালী : বন্ধুপাঁচালী উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য গান। সব ঋতুতেই এই গান শোনা যায়। দুর্গাপুজোয়, মঙ্গলচণ্ডীগানে, জিতুয়াঅষ্টমী, লক্ষীর গান, বাসন্তীপুজো, কালীপুজো, দোলউৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বন্ধুপাঁচালী' গানের আসর জমজমাট হয়ে বসতে দেখা যায়। কখনও বাড়ীতে ঘুরে ঘুরেও এই গান পরিবেশিত হয়।

নারী ও পুরুষের ভালবাসা, প্রণয়, বিরহজনিত ব্যথা, বিচ্ছেদের যন্ত্রনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মুখে মুখে রচিত ও বন্ধুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় যে গান তাকেই বন্ধুপাঁচালী বলে। এখানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই বন্ধুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পাঁচালী অর্থ গানরূপে পরিচিত। এই গানে পুরুষের চেয়ে নারীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী। তাই, গানের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে নারীর অবস্থার বর্ণনা।

বন্ধুপাঁচালী গানে কোনও ধারাবাহিকতা নেই। কখনও মান-অভিমানের ঘটনা, কখনও বিচ্ছেদের ঘটনা, কখনও প্রণয়ের ঘটনা, কখনও প্রেমের ঘটনা গানের সমতা রক্ষা করে। 'মুখ বোলান' হ'ল এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'মুখ বোলান' এর অর্থ হ'ল গান গাওয়ার পরে গানের অর্থ কথায় বুঝিয়ে দেওয়া। গান রচিত হয় দেশজ ভাষায় এবং গান গাওয়া হয় এদের নিজস্ব ঘরোয়া সুরে। বন্ধুপাঁচালী গানকে অনেকেই মন্ত্র বলে মনে করে। এই মন্ত্রই সুরে একাকার হয়ে গানে পরিণত হয়।

গান শুরু হয় সাধারণতঃ রাত্রি-আটটা-নয়টার মধ্যে। এই গানে আট থেকে দশজন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে দুইজন ছোকরা। ছোকরা অর্থ, যে ছেলে মেয়ে সেজে নাচে। একজন বায়েন, যিনি খোল অথবা ঢোলক বাজান। একজন মূল গায়েন। দুইজন বাপতিয়া। বাপতিয়া অর্থ জোকার। দুইজন দোহাদার। ছোকরা ও বাপতিয়া বাদে অন্যান্যদের পরনে থাকে ধুতি ও গেঞ্জি। ছোকরার পরনে ঘাঘরী ও বক্ষ আবরণী আর বাপতিয়ার হাতে থাকে থুর-থুরিয়া (লাঠি), মাথায় টুপি, গায়ে তালিমারা জামা।

মঞ্চের চারদিকে বসে শ্রোতৃবৃন্দ। মূল মঞ্চে কখনও বসে কখনও

দাঁড়িয়ে গান হয়। যে সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান পরিবেশিত হয়, সেসব ঘটনার পাত্র পাত্রী হয় ছোকরা ও বাপাতিয়া। এখানে ছোকরা মেয়ের ভূমিকায় এবং বাপাতিয়া বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করে। গান যেমন মূল গায়েন ধরেন, দোহার যেমন দোহা দেয়, তেমনি বাপাতিয়া ও ছোকরাও গানের সুরে সুর মিলায় এবং গানের তালের সাথে সাথে নেচে যায়। গান শুরু হবার আগে বন্দনা গান শুরু হয়।

গানের নমুনা—

বন্ধু বলছে ঃ

আমার মন কান্দে গে
আমার মন হরা
মনকে আমি দিলাম গে ব্যথা
ও হে আমার মনকে আমার মিটাইয়া
মন কে দিলাম আমি ছাড়িয়া
মনের মতন ওহে কন্যা
আর ত পাব না'

উত্তরে ছোকরা বন্ধু জানায় ঃ

ও নদের চান্দ
তুই মোকে কি মায়া নাগালু রে
নদের চান্দ
যখন ডালিম কড় কড়
তখন বন্ধু মোর নবীন ছোড়া
কি মায়া নাগালুরে
নদের চান্দ
যখন ডালিম ডাকর ডাকর
বন্ধু হইল মোর পরের চাকর
ওরে নদের চান্দ
যখন ডালিম হাইলারে পড়ে
তখন বন্ধু মোর ঘর আসে
ও মোর নদের চান্দরে,

নটুয়া ঃ নটুয়া কথার অর্থ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে, অনেকেই মনে করেন যে, নানা রকম কথা দিয়ে যে গান রচিত হয় তাকেই 'নটুয়া' বলে। এইগানে শৃগাল ও কাঁকড়া, মাছ ও ডিংডেই, তেলের কুলু, লালবোলতা প্রভৃতি নানান বিষয়ের উপর শ্লোক তৈরী হয়। যা 'খিশা' বা 'খন' নামে চিহ্নিত। মূলগান রচিত হয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই রাধাকৃষ্ণ হ'ল স্থানীয় সমাজের নর-নারীর ঘটনা-যা বৈষ্ণব পদকর্তাদের তৈরী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের অনুকরণ। বৈষ্ণব পদকর্তাদের যে সব রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকীর্ত্তন আঙ্গিকে গাওয়া হয়—'নটুয়া' গানেও, সে পদই নিজস্ব ভাষায় ও নিজস্ব ঘরোয়া সুরে গাওয়া হয়।

নটুয়া গানে থাকে একজন মূল গায়েন। তাঁর পরনে থাকে ধুতি কাপড় ও গেঞ্জি। কোমরে বাঁধা থাকে একটি ছোট মৃদঙ্গ। এই মৃদঙ্গ বাজিয়ে তিনি গান করেন। মূল গায়নের সাথে থাকে চার থেকে পাঁচজন দোহার। তারা গানে দোহা দেয়। এদেরও পরনে থাকে ধুতি-কাপড় ও গেঞ্জি। এছাড়া, গানে তিন থেকে চারজন ছোকরা লাগে। পরনে এদের ঘাঘরী। এদেরই একজনের হাতে থাকে একজোড়া করতাল। এদের কাজ হ'ল গানের সাথে নেচে যাওয়া। আর থাকে একজন বা দুইজন বাপতিয়া। নটুয়াগানে বাপতিয়ার ভূমিকা মূল গায়নের মত। বাপতিয়ার পরনে থাকে ফুলপ্যাণ্ট, তালিমারা জামা, কোমরে ঘাঘরা। মূল গায়েন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানের একটি অংশ গাওয়া শেষ করলেই ঐ ফাঁকে বাপতিয়া শ্লোক ধরেন। এই অবস্থাকে ফাঁকারি বলে। মূল গায়েনের দিকে লক্ষ্য করে বাপতিয়ার শ্লোক বলা শেষ হলে মূল গায়েন বলে ওঠেন, 'তোর মনের কথা তো বুঝতে পারলাম না'। তখন শ্লোকের বিষয়বস্তু বাপতিয়া বুঝিয়ে দেয়। এই গানে বাপতিয়ার গুরুত্ব রয়েছে শুরু থেকে শেষ অবধি। গানের মধ্যে দিয়ে বাপতিয়ার মুখ দিয়ে শাস্ত্রকথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার সঠিক অর্থ মূলগায়েনও বুঝতে পারে না। পরে তিনি হার স্বীকার করেন। জোকারের মুখ দিয়েই তার অর্থ বুঝে নেন। বাপতিয়া এখানে তত্ত্ব কথায় পণ্ডিত। তাই সে মূল গায়েনকে তার মূল গানে যেতে দেবার আগে তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করে। শেষে মূল গায়েন জব্দ হন।

'নটুয়া' গানে বাপতিয়া-র মুখ দিয়ে যে সব শ্লোক উচ্চারিত হয় তার

অর্থ একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি হাস্যরসেও উজ্জ্বল। তাই, শ্রোতারা মূল গায়েনের গান যতখানি না হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন তার চেয়েও বেশি বাপাতিয়ার উচ্চারিত শ্লোকগুলি শুনে তাঁরা ভাবে আত্মস্থ হয়ে উঠেন, কখনও হাস্যরসেও আপ্লুত হয়ে যান। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দেখা যায় ভাব ও ভাবনা এবং হাস্যরসের অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন। মূলগায়েন ও বাপাতিয়া বাদে এ গানে অন্যান্য ভূমিকায় যারা থাকেন অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করার জন্যই এদের আবির্ভাব ঘটে। একটি ছোট মৃদঙ্গ ও একজোড়া করতাল সহযোগে অপূর্ব তাল ও লয়ের মাধ্যমে 'নটুয়া' গান পরিবেশিত হয়। মাঝখানে তৈরী হয় একটি মণ্ড। মণ্ডের চতুর্দিকে শ্রোতারা বসেন। মণ্ডের উপরে থাকে বাপাতিয়া, মূলগায়েন, দোহার আর ছোকরা। গান পরিবেশিত হয় মণ্ডের চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে। গান শুরু হবার আগে মণ্ডে প্রথমে বন্দনা গান শুরু হয়।

গানের নমুনা ঃ

কাঞ্চন মাদারের খড়ি
ধুয়ার জ্বালায় কান্দে যশোমতী
ভাত হইল খড়খড়ি
তিতুন হইল বাসি
গরম ভাতে ওমরাদের
পড়িয়া মইল মাছি
কেমনে জাগাব আমি
নিন্দো-রো স্ব-আমি

ফাঁকারি—

লেপেয়া মুছিয়া সন্দাইছু ঘর
প্রণাম করবু তে গোলামের বেটা
দূর থেকে কর

গান—

ঘর হইল আভরণ
দুয়ারি গাজিল বন
ও হো সখী রে
স্বয়া (স্বামী) বিনে এ-বাংলায় আধারশ

ফাঁকারি—

রক্তবর্ণা দেহ তার
চক্ষু সারি সারি
হিমালয় পর্বতের মণি
শিরে জটাধারী
মায় নাই মগ্ন নাহি
লোকে-জনে খায়
হিমালয় পর্বতের কথা
শাস্ত্রতে কয়

বন্ধুআলা ঃ বন্ধুর জন্য রচিত গানকে 'বন্ধুআলা' বলে। এই বন্ধু মূলতঃ নারী ও পুরুষ। নর-নারীর মান-অভিমান, প্রণয়, মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এ-গান রচিত হয়। গানের জন্য কোনও নির্দিষ্ট মঞ্চ, দোহার, বাপাতিয়া, ছোকরা, বাদ্যবাদকবৃন্দ কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যা দরকারে লাগে তা হ'ল কাজ। মাঠে হাল বাইতে বাইতে বা গৃহে বসে কোন কাজের মাধ্যমে এ-গান গাওয়া হয়। গানে কোন যন্ত্রের ব্যবহার নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশই হ'ল এর আবহ সঙ্গীত।

গান রচিত হয় দেশজ ভাষায় ও গান গাওয়া হয় নিজস্ব ঘরোয়া সুরে। গানের ছন্দ মূলতঃ ত্রি-মাত্রিক। গানের এক স্তবক গাওয়ার পর পুনরায় ঐ স্তবকের প্রথম লাইনটি গাইতে দেখা যায়। প্রথম পংক্তিই গানের সমতা রক্ষা করে। প্রথম স্তবকের শেষের দু'-এক লাইন গাওয়ার সময় সুরে দীর্ঘ টান দিয়ে পুনরায় পরের চরণ ধরতে হয়। এ-অবস্থাকে 'চিতান' বলে।

'বন্ধুআলা' গান মুখ্যত করুণরস মিশ্রিত। সুর টেনে টেনে এ-গান গাইতে গাইতে কৃষকের চোখে জল এসে পড়ে। বিশেষ করে পূর্বে বা পশ্চিমে বাতাস বইলে এ গানের করুণ সুর শূন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করে তোলে। গানের শেষে কৃষক কাজ ছেড়ে সামান্য বিশ্রাম নেয়। গানের মর্মার্থ জীবনের সাথে মিলিয়ে নেয়।

গানের নমুনা ঃ

ওরে বেলা উঠিছে ঝলমল করিয়া নদী হচ্চু পাড়
এই দেখা রে স্বামী দেখা নাই হবে আর
ও মরি রে এই দেখাদেখি স্বামী
দেখা নাই হবে মোক্
জন্মের মত ছাড়িয়া যাচ্চু তোক্

তুই কি বঝিচুরে বাউদিয়া
কান্দেছে মোর মন
নিনদুতে ছাড়িয়া আসিনু
কলার স্বামীর ধন

তুই হে মোর না কান্দাইস্ গে মন
মুই হে পুড়াম তোর মনের আশা ধন
ও মরি রে বাগদিম বাংরাজদিম
কলাইভরা জল দিম
পা নাড়াইতে যাতে বাজে

মোর মায়া হইয়া নিন্দুতে ছাড়িলুগে
গেল মাই বন্ধুয়ার বাড়ী
সিংঝার মশাল ধরাইয়া মুই বেড়াচু অংশিয়া
বাঁশ বাড়ী কুশার বাড়ী পাট বাড়ী দিয়া
মায়া হইয়া তুই নিন্দুতে ছাড়িলুগে
গেলু মাই তুই বন্ধুয়ার বাড়ী।

লৌকিক পালাগান

সরিগান পালা ঃ উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে অগ্রহায়ণের প্রথম থেকে শুরু করে মাঘের শেষ অবধি চলে সরিগান পালা। নয়নসরি-বোষ্টমবাউদিয়া, অম্বলসরি-ছলপিবাউদিয়া, শীতলসরি-জানক প্রভৃতি পালাগান সাড়ম্বরে পালিত হয়।

নরনারীর সুখ-দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ও সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার স্বচ্ছন্দ চিত্র ও রঙ্গরসিকতাময় পরিবেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এ সব পালাগানে। কথকতা হ'ল সরি গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নয়নসরি, অম্বলসরি, শীতলসরি এরা সমাজে নারীরূপে চিহ্নিত। এদের মধ্যে কেউ বিধবা, কেউ কুমারী। অনুরূপভাবে বোষ্টম বাউদিয়া, পিছল বাউদিয়া ও জানক এরা পুরুষ রূপে চিহ্নিত। এদের মধ্যে কেউ গোঁসাই, কেউ সাধারণ যুবক। সরি মানে যে নারী সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। বাউদিয়া শব্দের অর্থ হ'ল, যে পুরুষ উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির।

এ সব পালাগানের দলে সাধারণতঃ বার থেকে চৌদ্দজন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এরা সবাই পুরুষ। গানের মুখ্য চরিত্রে থাকে নায়ক-নায়িকা ও ছোক্‌রা। এছাড়া থাকে বাপতিয়া ও কাহিনীনুযায়ী পাত্র-পাত্রী। মঞ্চের নীচে একধারে বসে বাদ্যযন্ত্র বাদকবৃন্দ। গান শুরু হবার আগে আসর বন্দনা শুরু হয়।

নয়নসরি বোষ্টম বাউদিয়া পালা

গানের নমুনা ঃ

নয়নসরি বোষ্টম বাউদিয়াকে বলছে—

তালপাতার খনজুরী হাতে
তোক্‌ নাকি বৈরাগী সাজে
আরে ও সেদিন হইতে
নাইরে নাথ

উত্তরে বোষ্টম বাউদিয়া নয়নসরিকে জানায়—

চারি জাতির নারী আছে
চারি জাতির পুরুষ

কোন্ বা জাতির নারী তুই
লজ্জা নাই মুখে

উত্তরে নয়নসরি বোষ্টম বাউদিয়াকে বলছে—

হাণ্ডি ভাঙ্গলে খোলা শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ হয় চাষে
নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধ কোন্ দিবসে

উত্তরে বোষ্টম বাউদিয়া নয়নসরিকে জানায়—

শাস্ত্র হেন কথা মাই গে
বলে তোমারে
গুরুর বাক্য মহা বাক্য
যে করে লঙ্ঘন
আখিরে কালতে হয়
নরকে গমন

অম্বলসরি পিছল বাউদিয়া পালা

গানের নমুনা ঃ

পিছল বাউদিয়া তার মাকে জানায়—

এমন কইন্যা দেখিয়া আসিনু
চাম্পা ধুতরার ফুল
নাক তো চিড়াতন আছে
পাটি পারা চুল

অম্বলসরি পিছলকে জানায়—

দাদা দেনা একটা মোক্ জিনিস
তোর জিনিসটা আতর দেয়া
ভবকিয়া ওঠে মন মোর
মুই বড় সুন্দরী দাদা
তুই বড় বোসিয়া

শীতলসীর জানক পালা

গানের নমুনা ঃ

জানক হাল বাইতে যাচ্ছে—

কান্ধে নিছু নাঙ্গল জংঙ্গাল
হাতে নিছু পিনাঠি
হাল বাইবা যাছুরে মুই
ঐ জলপই ডাঙ্গি

শীতল জানককে খাবার দিতে যাচ্ছে—

খাবা দেবা যাছুরে
দাদা হালবাড়ী
মাথা নিছু পন্থার থালি
হাতে নিছু জলের ঘটি
খাবা দেবা যাছুরে মুই
দাদা হালবাড়ী

এছাড়া রয়েছে, রামবনবাস, লক্ষণের শক্তিশেল, শঙ্করওঝাঁ, মাধবমালঞ্চাপালা, গুনাইবিবি, অস্তসরি, ঢাকেশ্বরী, চাঁদবোধনী প্রভৃতি পালাগান।

লোকজীবনে আতিথেয়তা

কোন উৎসব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-কুটুম, বন্ধুবান্ধব এলে একদিকে যেমন আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি খাদ্য-খাবারকে ঘিরে বিভিন্ন লোকাচারও পালিত হতে দেখা যায়। ভদ্রতা ও সামাজিকতায় এতই উদার যে, যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আতিথেয়তা ও খাদ্য-খাবারে কোন কিছুরই ত্রুটি করে না। এমনও দেখা যায় যে, কোন বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম এলে পাশাপাশি পাঁচটা বাড়ী থেকে লোকজন এসে ঐ বাড়ীর আত্মীয়-কুটুমের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করে যায়।

বিবাহ, পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ বিভিন্ন লৌকিক প্রথা অর্থাৎ সামাজিক যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজের প্রত্যেককেই নিমন্ত্রিত হ'তে দেখা যায়। খুব ঘনিষ্ট কুটুম বাদ দিয়ে বিশেষ করে মেয়েরা এইসব সামাজিক অনুষ্ঠানে আসে না। সমাজের মহতের উপর থাকে সমস্ত দেখাশুনার ভার। তিনি সুষ্ঠুভাবে অন্যান্যদের সহযোগিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন। যেহেতু প্রচুর লোকজন আমন্ত্রিত হয়, সে কারণে নিমন্ত্রিত লোকজনকে খাওয়ানো অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

এক একটি অনুষ্ঠানে চার-পাঁচ হাজারের মত লোকজন আমন্ত্রিত হয়। প্রথমে চেষ্টা করে গোটা সমাজের লোকজনকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর। কোন কারণবশতঃ অসুবিধা দেখা দিলে একত্রে এক হাজার দেড় হাজার লোক একসঙ্গে খেতে বসেন। সহজ ব্যবস্থায় ব্যাপক ভোজন চলে। খাওয়ার ব্যবস্থাকে এরা কেউ জটিল করে নেয়নি। প্রত্যেককেই আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়িত করতে দেখা যায়।

মূলতঃ ভাত-ডাল-তরকারী তা মাছেরও হতে পারে এই হল সামাজিক অনুষ্ঠানে খাবারের তালিকা। অল্প পদ ও ছিমছাম রান্না। রান্নার কাজকর্ম ও পরিবেশনের দায়িত্বে থাকেন পুরুষেরা। এখানে মেয়েদের কোনও ভূমিকা নেই। সামাজিক প্রথানুযায়ী মেয়েরা রান্নার কাজে নিযুক্ত হলে—সেই রান্না করা খাবার আমন্ত্রিতরা গ্রহণ করে না। এমনকি রান্না করা খাবার যদি মেয়েদের ব্যবহারের নতুন শাড়ী দিয়ে ঢেকে রাখা যায় অথবা ঐ শাড়ীর উপর

কোনও খাবার যদি রেখে দেয়—ঐ খাবারও কেউ খায় না। এই নিয়ম পারিবারিক রান্নার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

খাদ্য পরিবেশনের সময় প্রথমে ভাত দিয়ে পরে ডাল দেয়, তার পরে তরকারী। খাবার পরিবেশন শেষ হলে একসঙ্গে সবাই খেতে শুরু করেন। খাবার দেওয়া হয় কলাপাতা, পদ্মপাতা অথবা ডেপগুলার (কলার থোর কেটে তৈরী হয়) উপর। খেতে বসার সময় একই আসনের সাথে অন্য আসন লেগে গেলে নিয়ম বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। একসঙ্গে বহুলোকের বসার জন্য বাঁশের গোড়া একহাত পরিমাণ কেটে নিয়ে ফাটিয়ে আসন তৈরী করা হয়। খাবার সময় ভাতের পরিমাণই বেশী খেতে দেখা যায়। তরিতরকারীর পরিমাণ কম। মাছের তরকারী হলে বা মাংস হলে এর সাথে ভাতের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

খেতে বসে এরা কোন কথা বলে না। ধীরে ধীরে একটা একটা করে প্রতিটি খাদ্যবস্তু আস্বাদন করে। খাবার পাতে বসে কোনও চাওয়া নেই। পরিবেশনকারীকে দেখে নিতে হয় কার কি লাগে? যেমনই রান্না হোক না কেন—খাওয়ার পরে কারও কোন অভিযোগ থাকে না। এমনকি খাওয়ার সময় জল দিতে না পারলেও কারও কোন আপত্তি থাকে না। খেয়ে উঠার পর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে প্রণাম ও নমস্কার বিনিময় করেন।

গ্রামীন লোকবিশ্বাস

সামাজিক নিয়মানুসারে স্বামীর এঁটো স্ত্রী খায়। কিন্তু স্ত্রীর এঁটো স্বামী খায় না। অগ্রজের এঁটো লবণ ও এঁটো জল কেউ খায় না। বৌ-ঝিরা ননদের এঁটো ও ভাসুরের ছোঁয়া কোনও জিনিস খায় না। যদি কখনও খায় তবে সেই এঁটো থালায় অন্য কেউ খায় না। খেতে বসে কথা বলতে নেই, সম্পূর্ণ খাওয়ার খেয়ে তবেই কথা বলার নিয়ম। খেতে বসে কথা বললে অসুখের লক্ষণ রূপে বিবেচিত হয়। পরিবারে কারু প্রথম সন্তান হলে বৈশাখ মাসের প্রথমে কয়থা খাবার প্রচলন রয়েছে। ঐ সময় কোন কারণবশতঃ বাজারে কয়থা না পেলে কয়থার পাতা চিবিয়ে খেতে হয়। বৈশাখ মাসে কয়থা না খেলে জ্যৈষ্ঠ মাসে আর খাওয়া যায় না। সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্যই এই রীতির প্রচলন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাস অনেকেই কচু খায় না। শ্রাবণের শেষে মনসা পূজা শেষ হলে পুনরায় কচু খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। ভাদ্র মাসে লাউ খেতে নেই, ভাদ্রে লাউ খেলে সাপের বিষ নামে না বলে লোকবিশ্বাস। লবণ ও লঙ্কা হাতে হাতে দেয় না, এই দুটি জিনিস হাতে হাতে দিলে ভালবাসা লোপ পেয়ে যায়। খাবার সময় জোরে মাটিতে পিঁড়ি পড়লে বা থালা-বাসন পড়লে সেই পাতে ও সেই থালা বাসনে ঐ সময় কেউ খায় না। খুবই অশুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। খেতে খেতে হাঁচি পড়লে পাতের নীচে জল দিয়ে পুনরায় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে দেখা যায়। মুখে রুচি আনার জন্য লবণের সাথে সরিষার তেল খাওয়ার প্রচলন। পারিবারিক প্রথানুযায়ী ভাদ্রমাসে ভাই বোনের বাড়ীতে যায় না। যদি কোনও কারণ বশতঃ যেতে হয়—কোনও কিছু সেখানে খায় না। যদি নিতান্তই কিছু খেতে হয়—তাহলে, দেশীয় রাইসরিষা বেটে তা দিয়ে চিড়া খেতে দেওয়া হয়। মাঘ মাসে মূলা খাওয়ার প্রচলন নেই। মাঘের মূলা শিবঠাকুরের জট। ভাদ্রে করলা ও কয়থা কেউ খায় না। করলা খেলে বেশিপিত্ত হয় এবং কয়থা খেলে মহিষের সিং খাওয়া হয়। লাউ ও কুমড়া, মাছ ও মাংস, ডিম ও দুধ, আলু ও কচু, দুধ ও মুড়ি, কুমড়া ও মাছ এসব খাদ্য একসঙ্গে খায়না। কঠিন অসুখের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। দই, টক, চিড়া, ওল, মান

কচু, কালোকচু, তিতা, পেলকি, শাক এসব খাদ্য দিনে খায় কিন্তু রাত্রে খায় না। অসুখের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। আষাঢ় মাসে আমাইত বা অম্বুবাচী উপলক্ষে দুধ পান করতে হয়। ঐ সময় দুধ পান করলে সর্পভয় কেটে যায়। দুর্গা পূজার দশমীর দিনে শুকাতি বা জাতি পাটের শুকনো পাতা চিবিয়ে খেতে হয়। ঐ দিন শুকাতি খেলে সারাবছরের জন্য যে কোন জায়গায় গেলে যাত্রা শুভ হয়।

লোকজীবনে খাদ্যপ্রিয়তা

পরিবেশের সাথে সাথে মানুষের খাদ্যখাবার পরিবর্তিত হয়। আবহাওয়ার সাথে সাথে নির্ভর করে খাদ্যখাবারের নিয়মনীতি। সমাজে কৃষি উৎপাদন, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এরসঙ্গে ধর্মীয় প্রভাব ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠে এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ খাদ্যখাবার। কালের প্রচলিত ধারায় তা এমন একটা প্রথায় এসে দাঁড়ায় যা ঐতিহ্যবাহী। ফসল ঘরে এলে যেন ধনী গরীব নির্বিশেষে খাদ্যখাবারে পরিবর্তন দেখা যায়। ফসল উঠার সাথে সাথে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে তেমনি অপর দিকে চলে খাদ্যখাবারে অতিরিক্ত ব্যয়।

মোটা চালের ভাত তার সাথে কলাইয়ের ডাল আর বেগুনের তরকারী সাধারণ খাদ্য। ছড়াতেও এর আভাস পাওয়া যায়, 'হামরা গরীব চাষীর দল / মাঠত ফলাইরে ফসল/, জলত ভিজি, রোদত খাটি, বুকত করি বল/, হামরা খাটি দিনরাত, খাই দুটা ভাত'...। অন্যত্রে, 'হড় হড় গড় গড়/ কলাই ভাঙ্গি ডাইল কর / সেই কলাই খাবে তোর / মামা মাসীর ঘর' / অন্যত্রে, 'কইলা হালা হালা, বাইগন হালা হালা/মোর স্ব আমি বিয়াও করে আন্ধনের পালা'।

সাধারণতঃ মিঠা পাটের পেলকি, অম্বল, শুক্তি, তিতাপাঠের ভাজা, আলুভাজা, বেগুনভাজা, পটলভাজা, মুগকচুভাজা, সিমভাজা, বড়িভাজা, করলাভাজা, শুকনো লঙ্কাভাজা, চিংড়ি মাছভাজা, আলুসিদ্ধ, চমককচু সিদ্ধ, কাঁচাকলা সিদ্ধ, হেলাঞ্চাসিদ্ধ, মুলাশাক, ডাটাশাক, নাফা শাকের ভাজা, শান্ধলা, গাঁজি, ঝালভাত, আম ও জামের থেকথেকি, ছ্যাকা, ছ্যাকাদাল, মাছের ভর্তা, বাঁশের নুকা দিয়ে পাঁঠার মাংস, আম দিয়ে শোলমাছ, মধু দিয়ে মুড়ি, ঠাকুরী কলাইয়ের সিদ্ধ দিয়ে চালভাজা ও চিড়াভাজা, খেরুঙ্গা কলাইয়ের সিদ্ধ দিয়ে খৈ খাওয়া, শাটি মাছ ও শোল মাছ দিয়ে টমেটোর তরকারী, কোফ-দৈ, কচুর প্যাপের পাতরা, শীদল, কদু কলাইয়ের ডাল, নাউয়ের ভুটি, খারিশাক, পেলকি, কুমড়ো শুকিয়ে খণ্ডখণ্ড করে চেনা প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য। মাছের মধ্যে বোয়াল, কাতলা, রুই, মিরকা, শিংগী, কৈ, শোল, ময়া পুঁটি, বাইন ও পঁয়া মাছ প্রিয় মাছ। মাংসের মধ্যে, হাঁস, পাণিমাছ, ছাগল, কবুতর অতি-প্রিয়। নাফাশাক ও পঁয়া মাছের বিবরণ একটি ছড়াতে দেখতে পাই, 'হাফা

নদীরে নাফা শাক /, মেচী নদীর পঁয়া মাছ /, কাঙ্গে নিনু বেহেলা হাতে নিনু দত্‌রা / দেখ দেখি কে মতন মুই সাজিসু ছোকরা /, কবুতর ও ছাগলের মাংসের উল্লেখ পাওয়া যায় মাহুতের গানে, ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে /, যেদিন মাহুত আসাম যায় /, শরীর মন মোর ঝুরিয়া রয় /, হাঁস খাইলাম, কোতর খাইলাম, আর খাইলাম ছাগল /, আসাম দেশের মাইকে দেখি, মন হইল পাগল।'

শুকনো খাবারের মধ্যে মুড়ি, চিড়া, খই, বুট ও যবের ছাতু প্রধান। এছাড়া, মুড়ির নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, মুরখী প্রভৃতি পছন্দ সই খাদ্য। ময়দা দিয়ে তৈরী গজা, চিনির বাতাসা, মুণ্ডা, বুন্দিয়া, আখের গুড়, জিলাপী প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য। দুধ ও দই অতি আদরের আহার। পিঠার মধ্যে গুড়গুড়িয়া, ভাকা, তেলুয়া, খোকসা, খাটিয়া পল্টন ইত্যাদি। মুড়ি, খই, দই, দুধ ও চিড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন ছড়াতে, 'কাউয়া জোগায় খের খড়ি বগে আন্ধে ভাত /, হামার মাইটা ভাত খায় বগে দেলায় পাত /, শুকিয়া গেলেক বাটার পান, খাটা হোলক দৈ /, মোসীর বেটি দয়া জানে আনিল কুড়ি খৈ'। দুধ ও দৈ'এর বর্ণনা পাওয়া যায় ঠাকুর সোনা রায় ও রূপা রায়ের বর্ণনাতে, 'ঠাকুর সোনা রায় রূপা রায়ের ভাই /, বাঘের পিঠে চড়িয়ে—মইষের দুগ্ধ খায় /, যে হাটে গোয়ালার মাইয়া দধি নিয়া যায় /, আটকুরা বলিয়া দধি কিনিয়া না খায়'। চিড়া ও দুধের আভাস পাওয়া যায় শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ছড়াতে, 'বাউ চুড়া থুইসু চোখির তলৎ /, নিন্ আয় নিন্ আয় /, বাউ দুধের একটা খুড়ি থুইসু / নিন আয় নিন আয়'। মুড়ির নাড়ুর বর্ণনা পাওয়া যায়, 'মাই তোর বাপও গিসে হাট /, মাও গিসে হাট /, মাও আনিবে মলা নাড়ু /, বাপ আনিবে খাট'।

বিভিন্ন পুজা-পার্বণ, প্রথা, উৎসব অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সময়ে ফল আহার উল্লেখযোগ্য উপাদেয় খাদ্য। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, কলা, শশা, কেসুর, ডহা ও বেল অন্যতম। পুজা-পার্বন, উৎসব অনুষ্ঠানে মুখশুদ্ধি রূপে পান-সুপারী প্রধান। বাঘপালের কাহিনীতে পান ও সুপারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, 'দক্ষিণ দুয়ারীঘর, ঘন বাঁশের রুয়া /, বাখপালের ভোগে নাগে পান আর গু আ /, বাটাভরি কাটা গুআ পাঁচ বাঘে খায় / হগগল বাঘে বৈঠক করি—অরণ্যে তে যায়'।

ভাট শাকের কচিডগা (শালুক ফুলের পাপড়ি) দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার তরকারী একটি উপাদেয় খাদ্য। একসময় জামাই ঘরে এলে এ ধরনের রান্নার আভাস পাওয়া যায় একটি ছড়াতে, 'কুণ্টে গেলুরে কৈ তর জোড়া—ভ্যাট বাড়ী দিয়া /, ভ্যাটের আগাল আশ্দি থুইস্তু—ঘিৎ কুমড়ো দিয়া /, ঘিৎ কুমড়োর বাসতে, জামাই বসিল পাততে'।

নবান্ন উৎসব ও বিবাহ উৎসবে রান্নার তোড়-জোড় চলে পুরো মাত্রায়। নবান্ন উৎসবে প্রথম দিনে রান্না হয় নানা রকম শাকের ঘণ্ট, মাস কলাইয়ের ডাল, বেগুন ভাজা। এই উৎসবে আসবেন দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয় কুটুম এবং প্রত্যেকেই মাছ, মিষ্টি, দই কেউ কেউ খাসীও সাথে নিয়ে আসেন। এই উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মাছ, মাংস ও বিভিন্ন রকমের তরকারী রান্না হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে খই, দৈ, মুড়ি, চিড়া, দুধ, কলা, মিষ্টান্ন তৈরী হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য রান্না হয় মাছ বা মাংস, নানাপদের তরকারী, ডাল তার সাথে থাকে দই বুন্দিয়া।

শীতকালে কড়কড় ভাতের সাথে গরম তরকারী সহযোগে সকালের জল খাবার খেতে দেখা যায়। গরমকালে পান্তাভাত-মুড়ি-বেগুনপোড়া, লঙ্কা প্রভৃতি উত্তম আহার। এছাড়া, ভাজাচিড়া, মুড়ি, খই, মুড়কী প্রভৃতিও ব্যবহার হয়। বাঘাইমাছ, টেপামাছ, শালমাছ, চেংমাছ, টনামাছ, চান্দা, ভেদা ও বালি মাছ অনেকেই খায় না। খাদ্যখাবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হ'ল ঝাল। সবচেয়ে বেশী স্বাদের পছন্দ ঝালের উপর, তাই, প্রত্যেক তরকারীতে ঝাল দিতে বেশী দেখা যায়। কোনও আত্মীয় কুটুম ঘরে এলে অভ্যর্থনা খাবার হিসেবে দই, চিড়া, গুড় খেতে দেয়।

ধর্মমাস অথবা নিয়ম অনুযায়ী কোনও কোনও মাসে খাদ্যখাবার পরিবর্তিত হয়। যেমন, ভাদ্র মাসে গুড় খাবার প্রচলন রয়েছে। এমনি গুড় অথবা জলপানের সাথে গুড় খেতে এ সময় প্রায় দেখা যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে তিতা খাবার প্রচলন রয়েছে। তিতার জন্য নিমপাতা, পটলের লতি প্রভৃতি ব্যবহার হয়। এ সময় নিমের ছাল আর শুকনো বেলের শ্বাস ভিজিয়ে চিনি দিয়ে অনেকেই সরবৎ খান। গুড় দিয়ে কুলের টক, শাটি ও শোল মাছ দিয়ে টমেটোর তরকারী, নিম বেগুন প্রভৃতি ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের উপাদেয় আহার। মাঘমাসে বাশিয়া পিঠা পোড়া, শকর আলুসিদ্ধ, খেরুঙ্গা কলাই সিদ্ধ,

চালভাজা, চিড়াভাজা উপাদেয় আহার। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের টক, গোয়ালিয়া দই, খাটা দই, পাকা কলা, আমদিয়ে শোলমাছের, তরকারী, আম দিয়ে চিড়া-মুড়ি, কাঁঠাল-দুধ, জাম, পেঁপে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আহার। পৌষমাসে মুড়ি মুলা, বেগুনের ঝোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রাদ্ধে, বিবাহে, সত্যনারায়ণ পূজা, জীমূত বাহন পূজা সহ আরও বেশ ক'টি পার্বনে নতুন কাপড় পরে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে দেখা যায়। ষষ্টী-পূজার সময় নতুন কাপড় পড়ে মায়েরা ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে নাড়ু, মিষ্টি, ও মিষ্টান্ন খাইয়ে দেয়। 'ঢাকুন' প্রথাতে দেখা যায় নববিবাহিত কন্যা আত্মীয় কুটুম ও অতিথিদের নতুন কাপড় পরে খাদ্য বস্তু বিতরণ করছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেও কেউ কেউ নতুন কাপড় পরে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। এছাড়া লৌকিক ব্রতে যেমন, রাধাষ্টমী ব্রতে সারাদিন বিভিন্ন ধরনের ফল ফলারি, চিড়ামুড়ি, খৈ ইত্যাদি খাবার রূপে ব্যবহার হয়। মাঘমাসে শিব-চতুদশীর্ উপলক্ষে অনেকেই উপবাস থেকে শিবের মাথায় জল ঢালার পর ফল-ফলারি, দুধ-সাবু আহার করেন। ফাল্গুনে দোল ও পঞ্চম দোলে যবের, ছাতু, বুটের ছাতু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ফাল্গুনের দোল উৎসবের মত রঙ ও কাদা খেলা হয়, ঐ দিন যবের ছাতু বুটের ছাতু খাবার রূপে ব্যবহার হয়। যদি কোনও পূজায় হাঁস-কবুতর-পাঠা বলি হয় তবে তার মাংস পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ছাড়া রান্না হয়।

উৎসব-অনুষ্ঠানে কত লোক খেয়েছে তার পরিমাপ হয় হলুদ ব্যবহারের মাধ্যমে। অর্থাৎ কত পরিমানে হলুদ ব্যবহার হয়েছে তার থেকে নির্ণয় হয় আমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা। দিনাজপুর ও রঙপুরের গ্রামীন লোক সমাজে বিভিন্ন তরি-তরকারীতে হলুদ খাবার প্রচলন বেশী দেখা যায়। হলুদ বেশী দিলে মাছের আঁশটা গন্ধ থাকে না এবং ঝোলও সুন্দর রং হয়। হলুদ হজমের পক্ষে উপকারী। যে সব এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতির উৎপাদন বেশী হয়, সেইসব এলাকায় ঐ সব জিনিসের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। চর্বিযুক্ত খাসীর মাংস সবচেয়ে বেশী পছন্দসই খাদ্য। মাংস রান্নায় মশলাপাতির চেয়ে পেঁয়াজ, আদা ও লঙ্কা এবং সরিষার তেলের ব্যবহার বেশী। বিভিন্ন তরি-তরকারীতে মশলাপাতির ব্যবহার এমনিতেই কম দেখা যায়।

খেলেও সব রকম মশলাপাতি একসঙ্গে বেটে খায়। মশলাপাতি বাটার ব্যাপারে এদের মধ্যে বিহারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-খাবার খেতে দেখা যায়। যেমন, গ্রহের দশা হলে তা মুক্ত করার জন্য কেউ কেউ শোল, শাটি, চেং প্রভৃতি মাছ পোড়া দিয়ে খায়। কুকুরে কামড়ালে ঘি ও কলাপোড়া খেতে দেখা যায়। সর্দি ও কাশিতে অনেকেই আদা ও রসুনসহ চালভাজা অথবা শুধু ঘি বা পাটের পেলকি খায়। অতি খরা বা অতিবৃষ্টিতে অথবা কাজের সন্ধান না মিললে গ্রামে দরিদ্র সমাজে অভাব-অনটন দেখা দেয়। ঐ সময়ে খাদ্য-খাবারে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন হয়। অভাবে ভাতের বদলে জুটে নুন আর হলুদ দিয়ে তৈরী তোসাপাটের ভাজা, গুনজুরের ডাল (ছোট শামুক), শামুকের ভাজা (বড় শামুক), সজনা পাতার পেলকি, ডাণ্ডির ভাজা, কচুর ভাজা, টেকনি কচুর ভাজা (বেলের মত এক ধরণের ফল) (পেণ্ডালের ভাজা বেলের মত এক ধরণের ফল), গাক থোর'এর তরকারী (কলাগাছের ভেতরের শ্বাস), হেলাঞ্চের ভর্তা, কাঁচা কলা সিদ্ধ, পাকা কাঁঠাল, মাচালু আলু সিদ্ধ,) ব্যাঙের ছাতুর তরকারী ইত্যাদি।

সামাজিক নিয়মানুসারে কারুর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ১২ দিন অশৌচ পালন করে। ঐ সময় আতপচালের ভাত ও ঘি খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর ক্ষেত্রে খাদ্য-খাবারে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে দেখা যায় না। কারু বিয়ে হলে বিয়ের আগের মুহূর্তে চিনি-কলা-মিষ্টি-মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাত্রকে খেতে হয়। বিয়ের পর ভাত খায়। দেশভাগের আগেও অনেক পরিবারে মেয়েরা কোনও মাংস খেতো না। মেয়েরা মাংস খেলে সমাজে নিন্দা হ'ত। মাংস-পেঁয়াজ-রসুন প্রভৃতি খেলে শরীর ক্ষিপ্ত হয় বলেই সম্ভবতঃ মেয়েদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল না। এমন কি অল্পবয়স্ক শিশুদেরও ঐ সব জিনিস খেতে দিতো না।

লোকজীবনে পোষাক

উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যাঁরা ঘোরাফেরা করে থাকেন তাঁরা ঐসব অঞ্চলের নারী-পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের এক ধরনের পোষাক পরতে দেখে থাকবেন। এই পোষাক বলতে পুরুষেরা ব্যবহার করেন 'নেংটি' আর মহিলারা 'বুকানি' ব্যবহার করে থাকেন।

'নেংটি' ও 'বুকানি' ব্যবহারের পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ যোগাযোগের অভাবের দরুণ আগেকার দিনে কাপড় গ্রামে পেঁছানো সবসময় সম্ভবপর হ'ত না। গ্রামবাসীরাও যে শহর থেকে কাপড় কিনে আনবে যাতায়াত আর যোগাযোগের অভাবে তা ছিল কষ্টকর। কাজেই কাপড় পরার ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে উঠতো দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, 'নেংটি' ও 'বুকানি' ব্যবহারে আবহাওয়ার প্রভাবও হয়ত কিছু পরিমাণে রয়েছে। কাদা-মাটি আর ধুলো-বালি সেইসাথে গায়ের ঘামে কাপড় ক'দিন টেকে? এরচেয়ে 'নেংটি' ও 'বুকানি' ঢের ভাল, এমনই এক মানসিকতা এই পোষাক ব্যবহারের পিছনে রয়েছে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় কাপড় কেনার অনেকেরই সামর্থ্য ছিল না। তাই, নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় প্রথায় অল্প খরচে নিজেরাই নিজেদের পোষাক বানানোর তাগিদ অনুভব করেছিল।

গ্রামে যে একসময় কাপড়ের প্রচণ্ড সঙ্কট ছিল এবং 'নেংটি' ও 'বুকানি'র ব্যবহার যে কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছিল, তা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়। কারু বাড়ীতে বিয়ে লাগলে বিয়ের কাপড় উভয় পক্ষেরই (কন্যা ও পাত্রপক্ষ) জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে উঠত। তাই বিয়ের জন্য সারা গ্রামের মধ্যে থাকতো একটি মাত্র ধুতি ও একটি শাড়ী। সেটি থাকত গ্রামের মোড়ল বা প্রধানের বাড়ীতে। বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে বর ও কনে পক্ষের লোকজন মোড়ল বা প্রধানের বাড়ী থেকে তা চেয়ে আনতো। শুধুমাত্র, বিয়ের লগ্নের সময় বর-কনে 'নেংটি' ও 'বুকানি' ছেড়ে ঐ ধুতি পরতে পারতো, বিয়ে হয়ে গেলে আবার ঐ 'নেংটি' ও 'বুকানি' পরেই হত ফুলসজ্জা। এইভাবে ঐ একটি ধুতি ও শাড়ী দিয়ে শত সহস্রের বিয়ে চলতো।

'নেংটি' বলতে বোঝায় একফুট চওড়া, আড়াই অথবা তিনহাত লম্বা একখণ্ড কাপড়, কোমরে জড়িয়ে দুই উরুর মধ্যে দিয়ে পেছনে গুঁজে দেওয়া। কেউ কেউ একে 'গংঠি' ও বলে। 'বুকানি' বলতে, তিনহাত চওড়া, চার হাত অথবা সাড়ে চার হাতের মত লম্বা, বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে রাখা। একে কেউ কেউ 'ছেওটা' বা 'দোস্তি' বলে। 'বুকানি' ব্যবহারে ব্লাউজ এবং পেটিকোটের প্রয়োজন হয় না। খাসিয়া, গারো, মণিপুরী ইত্যাদি পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে 'বুকানি'র অনুরূপ একটি পোষাক দেখা যায়, সেখানে তারা একখণ্ড কাপড়ের পরিবর্তে দু'খণ্ড কাপড় ব্যবহার করে, সেটি ঠিক ঠিক 'বুকানি' না হলেও অনুরূপ। দিন বদলের সাথে সাথে ইদানীং 'নেংটি' ও 'বুকানি'র চল উঠে যাচ্ছে।

লোকজীবনে অলংকার

পায়ের অলংকার : বাগ—পায়ের গোড়ালিতে পরে। একজোড়া বানাতে পনের-কুড়ি ভরি রূপা লাগে।

ছড়—পায়ে পেঁচানো রিং'এর মত এই জিনিসটি দেখতে। দশ থেকে পনের ভরি রূপা লাগে।

মল—সাত থেকে আট ভরি রূপা দিয়ে তৈরী। মলের মুখ দু'টি বাঘের মুখের মত দেখতে।

হাতের অলংকার : কাটাবাজু—দশ থেকে বার ভরি রূপার তৈরী এই জিনিসটি বাহুতে পরে।

খাড়ু—ভেতরে বলের মত, ছোট করে বাজে, মল জাতীয় এই জিনিসটি তৈরী করতে দশ থেকে বার ভরি রূপা লাগে।

চুড়ি বা বালি—এ গুলি সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরী হয়।

আঙ্গুট (আংটি)—হাতের আঙ্গুলে পরে। এটি সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরী হয়।

গলার অলংকার : তাবিজ—ঢোলের মত বা ধানের মত দেখতে এই জিনিসটি। এর মাঝখানে ছোট রিং থাকে। কালো বা লাল সুতো দিয়ে গেঁথে গলায় পরতে হয়। সোনা দিয়ে বা রূপা দিয়ে তাবিজ তৈরী হতে দেখা যায়। এছাড়া রয়েছে গলার হার।

মাথার অলংকার : সিঁথিপাটি—রূপার তৈরী সিঁথিপাটি সিঁথির দু' দিক দিয়ে পরে। এছাড়া থাকে রূপার তৈরী খোঁপাকাঁটা, এগুলি দেখতে কোনটি ফুলের মত, কোনটি বেলের মত।

কানের অলংকার : কানের অধিকাংশ অলংকারই সোনা দিয়ে তৈরী। যেমন, মাকড়ী, বালি, ঝুমকা, কানপাশা ইত্যাদি।

নাকের অলংকার : নোলক—বড় রিংয়ের মত দেখতে। সিঁথি থেকে নাক পর্যন্ত চেন থাকে। জিনিসটি তৈরী হয় সোনা দিয়ে। এছাড়া চিড়া বা

পানের মত তৈরী নাকফুল যা চিড়াতন বা পানপাতা নামে পরিচিত। এগুলিও সোনা দিয়ে তৈরী।

নাকমতি ঃ নাকের মাঝখানে ফুটো করে সোনা দিয়ে তৈরী একটি জিনিস পরতে দেখা যায়। একে নাকমতি বলে। মতি গোল রিংয়ের মত, মাঝখানে লং ফুলের মত একটি দানা থাকে। লোকবিশ্বাস যে, মেয়েরা নাকমতি না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়। তাই, নাকমতি প্রত্যেক নারীকেই পরতে দেখা যায়।

লোকজীবনে শিল্পকলা

উত্তরবঙ্গের গ্রামীন জীবনে লোককলাশিল্প লোক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বঙ্গের বেশ কিছু সংখ্যক গ্রামীন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকলার সাথে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। গত দুইদশক ধরে গ্রামীন অর্থনীতিতে এইসব শিল্প একদিকে যেমন সাড়া জাগাচ্ছে। অপরদিকে তেমনি এই শিল্পবস্তুর মাধ্যমে লোকশিল্পীরা তাদের অপূর্ব শিল্পীমনের পরিচয় দিয়ে সৃষ্টশিল্পবস্তু সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন, কেউ পুরস্কৃত হচ্ছেন, কেউ বিশেষ সুনাম অর্জন করে উত্তর-বঙ্গের এই লোককলা শিল্পের মানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছেন। এইসব শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প, সোলার কাজ, ধোকড়াশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশের তৈরী শিল্পবস্তু সমূহ, মাদুরশিল্প, প্রভৃতি অন্যতম। জীবনের নানা সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকট সহ্য করেও রাজবংশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিল্পীরা অতি প্রাচীন কাল থেকে বংশ পরম্পরায় এইসব শিল্পের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এইসব শিল্পবস্তুর মাধ্যমে একদিকে যেমন লোকশিল্পীদের রুচি ও চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশ হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এই শৈল্পিক বিকাশের জন্য তারা আনন্দও লাভ করে থাকেন। তাই, ব্যবসাগত ভাবে এসব শিল্প তেমন লাভজনক নয়।

মৃৎশিল্প : মাটি দিয়ে তৈরী মনসা, লক্ষী ও মহামারী ঠাকুরের পট, দেবদেবীর মূর্ত্তি, খেলনা পুতুল, দেবদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত মানতের ঘোড়া ও হাতি, নিত্য ব্যবহারের জন্য মাটির থালাবাসন, পেচী, চুনাতি, কুপি, ঢেঁকি, টকা, তাড়ি, ঢাকন, ব্যাঙ, চারখুটিয়া, মাটি দিয়ে দেওয়ালে আঁকানো লতাপাতার নকসা, ছিলিম, পুজা-পার্বনাদির জন্য প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, তুলসীবেদী, ঘট, সরাই, আদিসরা (এর উপর লতাপাতা আঁকানো থাকে), কু-মণ্ডল, ফুলের টব প্রভৃতি শিল্পকলার এক অপূর্ব নির্দশন।

মাটির মনসার পট : মাটির সরার উপর মনসার তিন ধরনের পট তৈরী হয়। কোনটা শুধু অষ্টনাগের প্রতিকৃতি, কোথাও নাগের পাশে লক্ষীন্দর

ও বেহুলার মূর্ত্তি, কোনটায় ঐ নাগের পাশে লক্ষীন্দরে একজন সারথী ও বেহুলার একজন সহচরীর মূর্ত্তি। সরার পটে মনসার দেবীমূর্ত্তি তৈরীহয় না, স্বতন্ত্র ভাবে তা তৈরী করতে হয়। দেবীমূর্ত্তি তৈরীর জন্য মাটির সাথে কাঠ ও খড় মিশ্রিত করা হয়। কাঠ ও খড় দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী হলে, মায়ের রূপ অনুসরণ করে চক্ষুদান ও প্রান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা পূজা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই পূজায় পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। সরার পটে কোনরকম কাঠ ও খড়ের দরকার হয়না, ফলে সরার মনসার পট মূলতঃ পুরোহিত ছাড়াই পূজা হয়। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এই পূজা করেন। পট ছাড়া মনসার ঘট পূজারও প্রচলন রয়েছে। পঞ্চনাগ বা অষ্টনাগের মূর্ত্তি দিয়ে মাটির এই ঘট তৈরী হয়।

মাটির লক্ষী ও মহামারী ঠাকুরের পট ঃ সরার উপর লক্ষীর পট মূলতঃ তিন রকমের চিত্রিত হ'তে দেখা যায়। লক্ষী-নারায়ণ, লক্ষী- নারায়ণ ও সারথী এবং লক্ষী ও তার বাহনের প্রতিকৃতি। মাটির সরার উপর মানুষের মূর্ত্তি আঁকিয়ে মহামারী ঠাকুরের পট তৈরী করা হয়। রান্নাঘরের চালের বাতার ভেতরে মহামারী দেবের বসবাস। বছরে একবার অগ্রাহয়ণ মাসে নবান্নের দিনে এই পূজা হয়। গৃহস্বামী এই দেবতার পূজা করেন।

মাটির সরার উপর দেবদেবীর এই পট বানাতে প্রয়োজন হয় একধরনের পিচ্ছল মাটি, যা মূলতঃ বিলে পাওয়া যায়। এই মাটির সাথে কিছু বালু মিশ্রিত করে নিতে হয় যাতে সরাটি ফেটে না যায়। এই সব সরার এক একটির আকার ৯ ইঞ্চি করে। মাটি ছেনে একটি সরা বানাতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা, সরার উপর মূর্ত্তি আঁকতে ৪ ঘণ্টা, রংগের উজ্জলতা আনতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা। অর্থাৎ এক-একটি সরার পটের জন্য মাটি ছানা থেকে শুরু করে মূর্ত্তি আঁকা ও রংগের জৌলুষ ফিরিয়ে আনতে মোট ৭ ঘণ্টা লেগে যায়। এক একটি পটের বিনিময় মূল্য দুইটাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। এসব পট রং করতে মিনালাল, বনকাঠাল (ডহা) ও ঝিংগা গাছের ছালের রস প্রয়োজন হয়। পটের উপর বাড়তি চাকচিক্যের জন্য গর্জন তেল বা গাম তেল ব্যবহার হয়।

কাহিনীকে অবলম্বন করে রাম, রাবন, গরুড়, খড়দূষন, বরাহ, নরসিংহী, রাক্ষস, হনুমান, সীতা প্রভৃতির মুখোশ লোকপালায় ব্যবহার হয়ে আসছে। এছাড়া, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে কালীর মুখোশ, গম্ভীরা উপলক্ষে কালী দুর্গা, শিব-পার্ব্বতী ও বিভিন্ন জীবজন্তুর মুখোশ এবং জিতুয়া পূজা উপলক্ষে ভাল্লুক, বাঘ, মহিষ প্রভৃতির মুখোশ নৃত্য লোকনাট্যের এক আকর্ষনীয় অংশ।

ধোকড়াশিল্প ঃ পাটের লাছির অবাঞ্ছিত অংশ বাদদিয়ে চিকনঅংশ দিয়ে তৈরী এই বস্তুটি গায়ের আবরন বিছানার চাদর, বসবার আসন রূপে ব্যবহার হয়। ২০ ইঞ্চি চওড়া করে যে পাট বস্ত্র তৈরী হয় একে ফাটিয়া বলে। এরকম তিন টুকরা ফাটিয়া একত্রিত করে একএকটি ধোকড়া তৈরী হয়। এর আকার ৫ থেকে ৭ ফুট। নানা রং বেরংগের কারুকার্যময় এইবস্তুটি শিল্প সুষমার নির্দশন। এছাড়া, পাটের লাছির চিকন অংশ ও সুতো দিয়ে তৈরি হয় পরনের কাপড় নেংটি ও বুকানি বাচ্চা শিশুকে পিঠে বেঁধেনিয়ে যাতায়াত ও কাজের সুবিধার্থে তৈরী হয় আঘুন। রান্নার জিনিসপত্র রাখার জন্য সিকিয়া বা সিকা, ব্যাগ, বসবার আসন, বাজারের থলে ইত্যাদি। এছাড়া, রয়েছে নকশী কাঁথা শিল্পকলা। কাঁথার উপরে রামায়ন ও মহাভারতের কোন কাহিনীর ছবি, যুদ্ধের ছবির কোন দৃশ্য, গাছ, লতাপাতা, বিভিন্ন জীবজন্তু যেমন, পাখি, হাতি, বাঘ, কাকাতুয়া অথবা গ্রামীন দৃশ্যাবলী বাড়ীঘর, গাছপালা প্রভৃতি রং বেরংগের সুতা দিয়ে তৈরী সূচীশিল্পের নকশী কাঁথা।

বাঁশ দিয়ে তৈরী শিল্পবস্তু সমূহ ঃ বাঁশের তৈরী ফুলের সাজি, ডালি, চালুন, বরণডালা, কুলা, পাখা, খইচালুন, মাছ আটকাবার জন্য ডিংডই, বানা বা চোষ, বাঁশের খেলনা সাপ, পুতুল, ফুলদানি, বসবার খাটিয়া (দড়ি ও বাঁশের তৈরী), শোবার খাটিয়া, রান্নার জিনিসপত্র রাখার জন্য টেকটি, হোঁগলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তালপাতার পাখা, তালের আঁটি দিয়ে দেবদেবী ও জীবজন্তুর মুখোশ, সিন্দুরের কৌটা, কাশফুল ও গমের ডাটি দিয়ে উন্নতমানের ঝুড়ি, খেজুর পাতাদিয়ে পাটি ও ঝাটা, ছন ও কাশফুলের ডাটিদিয়ে ঝাটা উলেখ্য।

অন্যান্যশিল্প ঃ উত্তরবঙ্গের গ্রামীন লোকজীবনে মাদুর এক উল্লেখযোগ্য শিল্প। একধরনের জলজকাঠি চাষ করে উৎপাদিত কাঠি দিয়ে বিভিন্ন রংগের মিশ্রনে এই শিল্প তৈরী হচ্ছে। আসামের সীমান্তবর্তী এলাকার পাশে যে সব অঞ্চল উত্তরবঙ্গের মধ্যে পড়েছে, সে সব অঞ্চলে বেতের তৈরী পাটি, চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি ও বিভিন্ন রকমের শিল্পবস্তু তৈরী হচ্ছে।

লোকজীবনে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

ধর্ম সংস্কার আন্দোলন

অখণ্ড উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার জেলায় রাজবংশী সমাজ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর। শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ছিল খুবই কম। গ্রাম-গ্রামান্তরে ছিল কিছু লোয়ার ও আপার প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে রাজবংশী সমাজের ছেলে পড়ুয়ার হার ছিল শতকরা ৪ থেকে ৫ জন। যারা পড়তে আসতো তাদের অধিকাংশরাই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে বেশিরভাগই লেখাপড়া বাদ দিয়ে সংসারের হাল ধরতে ব্যস্ত থাকতো। শতকরা ১টি বা ২টি পরিবার পাওয়া যেতো যাদের ছেলেরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে যেতো। নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না।

বিভিন্ন ধরনের লৌকিক পালা, পূজাপার্বন, প্রবাদ-প্রবচন, লোকগান, রূপকথা, গ্রামীন যাত্রা এ সবেরই মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় অবিচারের কথা, নীতিশিক্ষা ও লোক শিক্ষা দ্বারা প্রচারিত হ'তো। দেশ ভাগের আগে ঐ সব জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে রাস্তাঘাটের কোনও সু-ব্যবস্থা ছিল না। কাঁচা রাস্তা, মাটিও সেখানে পড়তো না। পঁচিশ ত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ী বা পাল্কী চড়ে মানুষ সদরে যেতো। রাস্তায় পড়তো বিভিন্ন নদী। সেখানে কোনও সেতু ছিল না। নৌকা ছিল এপার ওপারের যোগাযোগের মাধ্যম। বর্ষাকালে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠতো। প্রতি আট-দশ মাইল অন্তর অন্তর ছিল এক একটি কুয়ো বা ইঁন্দারা, আর ছিল কিছু দীঘি ও পুকুর। সেখানে গরু মহিষ স্নান করানো হ'তো আবার সেই জল মানুষও খেতো। পানীয় জলের কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। মাহান্তলি ও ঝাড়ফুঁকই ছিল চিকিৎসার একমাত্র উপায়। প্রতি থানায় একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল বটে, সেখানে গ্রামের মানুষ প্রায় যেতো না। সেচের অভাবে হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকতো। কৃষকদের একমাত্র আকাশের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকতে হ'তো। আবার বন্যা রোধেরও কোনও

উপায় ছিল না। বন্যা হলে নদীর জল উপচে পড়ে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট করতো।

সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার এই প্রভাব এদের সমাজে প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। এরই ফলে রাজবংশী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই জাতিকে কি করে জাগ্রত করা যায় তার চিন্তা ও ভাবনা শুরু করেন। ইংরেজী ১৯১০ সালের ১লা মে রংপুরে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় রাজবংশীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চানন বর্মা ক্ষত্রিয়দের শক্তি সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রচারকের দায়িত্ব নেন। ক্ষত্রিয় জাতির ব্রাত্যত্ব মোচনের জন্য নবদ্বীপ ও বারাণসীর পন্ডিতগণের উপদেশক্রমে ১৯১২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঐ সালেই মোট ২৫১টি মিলনসংসদ তৈরী করে দুই লক্ষেরও বেশি রাজবংশী যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। এই ঘটনার খবর দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐসব জেলায় ক্ষত্রিয় সমিতি গঠিত হয়।

পৈতা নেওয়ার বিষয়ে ধর্মীয় কিছু লোকাচার পালিত হয়। যেমন—ব্রাহ্মণদের ১১ বছরের মধ্যে পৈতা নিতে হয়। কিন্তু রাজবংশী সমাজে ১৬ বছরের পর পৈতা নিতে হয়। পৈতা নেওয়ার আগে চৈতন রেখে মস্তক মুন্ডন করতে হয়। পরে নতুন একটি হলুদ লাগানো ধুতি পরে মাটিতে একটি আসনের উপর বসার পর ব্রাহ্মণ মাথার উপর দিয়ে আরও একটি নতুন ধুতি দিয়ে আড়াল করে মন্ত্রপাঠ করান। এভাবে মন্ত্র নেওয়া হলে শুরু হয় হরিনাম সংকীর্তন। উপবীত গ্রহণের পর ৫টি তামার পয়সা ব্রাহ্মণকে দান দিতে হয়। উপবীত গ্রহণকারী পৈতা না হওয়া অবধি উপবাস থাকে। ঐদিন সমাজের দশজন নিরামিষ ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হন। যাজনের নিয়মানুসারে পৈতাধারীকে ত্রি-সন্ধ্যা পালন করতে হয়। পৈতা নেওয়ার সময় এদের এক অংশ দন্ডী দেয়, ভিক্ষা নেয় ও ঘরে থাকে। কোনো কারণবশতঃ পৈতা না হলে শ্রাদ্ধবাসরেও তাকে পৈতা নিতে দেখা যায়। বিয়ের সময়েও কেউ কেউ পৈতা নেয়। বিয়ের দিন কনে ও বরের গায়ে হলুদ দেবার পর বরের বাড়ীর কুলগুরু এবং কনের বাড়ীর কুলগুরু বর ও কনেকে গুরুমন্ত্র দেন। একে

কর্ণবেদ বলে। এই মন্ত্র এদেরই সমাজে যারা গোঁসাই হন তারাই দেন। গোঁসাইদের কাজ শিষ্যবাড়ীতে শ্রাদ্ধ, সেবাশান্তি ও বিবাহে পুরোহিতগিরি করা। এর বাইরে যে গ্রাম্য দেবতার পূজা হতো এরজন্য থাকতো পূজারী, যাকে দেবংশী বলে। যারা দেবতার মানতের উৎসর্গকৃত পশু বলি দেয় তাদেরকে মালী বলে। মালীর কাজ হাঁস-পায়রা-পাঁঠা প্রভৃতি বলি দেওয়া। সমাজে বৈদিক আচার আচরণের প্রচলন ছিল না বলে পূজা-পার্বনে নিজেরাই ঈশ্বর সেবা দিতেন। কালী-দুর্গা-চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা নিজেরাই করতেন। গুরুবংশে কারও জন্ম হলে আঁতুড় ঘরেই তাকে কর্ণবেদ মন্ত্র দিতে হয় এবং এককান ফুটো করে কানে স্বর্ণরিং পরিয়ে দেয়। আঁতুড়ে কর্ণবেদ না হলে নবজাতকের হাতে কেউ জল নিতো না।

বিভিন্ন এলাকায় ধর্মসংস্কারের জন্য বাইশী গঠিত হয়। বাইশী সম্মেলন ২২টি মৌজার মহতরা মিলিত হয়ে ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা করতেন। এছাড়া, বাইশী উপলক্ষ্যে মহামিলন ক্ষেত্র তৈরী করে উপবীত গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। হাজার হাজার রাজবংশী ঐ অনুষ্ঠানে পৈতা নিতেন। পরবর্তী মহামিলন ক্ষেত্র কোথায় হবে, কোন্ কোন্ এলাকার অধিবাসীরা পৈতা নেননি, কোন্ কোন্ এলাকায় পৈতা দিতে হবে, ধর্মীয় নিয়মনীতি কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, কেউ নিজ-নিজধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে কিনা, কেউ চুরি ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা, কেউ নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে কিনা—ইত্যাদির বিচার বিবেচনা শলা পরামর্শ চলতো।

ধর্মকে উপলক্ষ করে কিছু কিছু এলাকায় প্রভাবশালী রাজবংশীদের সাথে ক্ষত্রিয় সমিতির কর্ণধারদের কিছু মতান্তর ও বির্তকের ঘটনাও ঘটেছে। এছাড়া, দিনাজপুর ও মালদহের ক্ষত্রিয় সমাজেও কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। এই দুই জেলার কিছু গ্রামে বিদেশি মিশনারীর দল ঘুরে ঘুরে খৃষ্টের বাণী প্রচার করতো এবং ঐ সব গ্রামের রাজবংশীদের খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য নানা প্রলোভন দেখাতো। এরই প্রলোভনে পড়ে কিছু রাজবংশী খৃষ্টান হয়ে গেলে ঐ সমাজে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে ক্ষত্রিয় সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঐ বিধর্মীরা পুনরায় নিজ ধর্মে ফিরে আসে।

সমাজ সংস্কার আন্দোলন

১৮৯১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি রংপুর শহরবাসী জমিদার হরমোহন রায়ের সভাপতিত্বে 'রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার মাধ্যমে ১৮৯১ সালের সেন্সাস শুরু হলে রাজবংশীরা তাদের জাতির ঘরে 'ভঙ্গ ক্ষত্রিয়' লেখার দাবি জানান এবং বৃটিশ সরকার তা মেনে নেন। ১৯০১ সালে নগেন্দ্র নাথ বসুর বিশ্বকোষে রাজবংশী শব্দের অর্থ ম্লেচ্ছ বা তদ্রূপ জাতি বলে উল্লেখ থাকায় আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০১ সালের লোকগণনায় রাজবংশী ক্ষত্রিয়কে কেবল 'রাজবংশী' বলে চিহ্নিত করার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এরপর শুরু হয় পদবী বর্জনের আন্দোলন। কেউ কেউ দাস পদবী বর্জন করে সিংহ, রায়, বর্মন প্রভৃতি ক্ষাত্র পদবী গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের খবর স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সব জেলার রাজবংশীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তদুপরি ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। এই দুয়ের সমন্বয়ে এদের চিন্তা ও চেতনার মোড় ফিরতে শুরু করে।

ক্ষত্রিয় সমিতির ১৯২৫ সালের বিস্তৃত বিবরনীতে ঠাকুর পঞ্চাননের লেখিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় চার'শ ক্ষত্রিয় প্রথম মহাযুদ্ধে গিয়েছিল।

১৯২৭-২৮ সাল থেকে ঐসব জেলায় ক্ষত্রিয় সমিতির পরিচালনায় সমাজসংস্কার আন্দোলন জোরদার ভাবে পরিচালিত হয়। ঐসময় ক্ষত্রিয় সেনাবাহিনী, নারীউদ্ধার সমিতি, ক্ষত্রিয় পত্রিকা প্রকাশ, ক্ষত্রিয় ব্যাংক নির্মান, লোন অফিস, মাতৃমঙ্গল সমিতি, বিদ্যালয় গঠন, ছাত্রাবাসনির্মান প্রভৃতি গঠিত হয়। এছাড়া মণ্ডল সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে হরিসভা, ধর্মীয় আলোচনা, নীতি-শিক্ষা প্রভৃতি প্রচারিত হয়। ক্ষত্রিয়দের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা প্রভৃতিও শেখানো হয়। গ্রাম্য ক্ষত্রিয়দের উন্নতির জন্য গ্রাম্য ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির উপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকতো। গ্রামে কার অসুখ হলে সমিতির মাধ্যমে তার চিকিৎসা চলতো। সমিতির খরচ চালানোর জন্য চার আনা থেকে দুই তিন টাকা পর্যন্ত চাঁদা নেওয়া হতো। দুঃস্থ

বিধবাদের আশ্রয় ও ভরণ পোষণ এবং পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা হতো। বিপদাপন্ন বালবিধবাদের উদ্ধার করে রংপুর জেলার ক্ষত্রিয় সমিতির অধীনে নারীরক্ষা সমিতিতে রাখা হতো। গ্রামে কারু বাড়ীতে কোন পুজো বা অনুষ্ঠান হলে ঘর সমাজ এবং পর সমাজকে নিমন্ত্রন জানানো হতো। বাইশী, সাতাশী অথবা বাহান্ন পট্টির সমাজপতিরা এই উৎসবে যোগ দিতেন। সমাজের হিত কামনার জন্য সমাজ পতিরা সেখানে উপদেশ ও নীতিমূলক কাহিনী প্রচার করতেন। কি করে ক্ষত্রিয়দের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

স্বীয় অপকর্মের জন্য সমাজ থেকে যারা উচ্ছেদ হত পুনরায় সমাজে ফিরে আসার জন্য তারা সমাজপতিদের সম্মতি চাইতো। সমাজ পতিরা সম্মতি দিলে 'যোগতী' সভায় তাদের বিচার চলতো। সমাজচ্যুতরা স্বীয় কৃত কর্মের জন্য সমাজের কাছে ক্ষমা চাইত, পরে যোগতী সভায় বিভিন্ন এলাকার মহতগণ একমত হলে সমাজ চ্যুতদের পুনরায় সমাজে ফিরে আসার জন্য প্রায়শ্চিতের নির্দেশ ও জরিমানার আদেশ দিতেন। সামর্থ্য অনুযায়ী জরিমানার টাকা নির্ধারিন করা হত।

১৯৩০ সালের পর কয়েকবছর রংপুরে ও ময়মনসিং জেলায় ব্যাপক নারী ধর্ষণ হয়। ১৯৩৩ সালে দিনাজপুরের অন্তগর্ত খানসামা থানার অধিবাসী খোলা বর্মনের মেয়ে ভেন্ডীবর্মনীকে নিয়ে দুবৃর্ত্তরা পালিয়ে যায় এবং তার উপর অত্যচার করে। এ ঘটনায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে নারীরক্ষন তৎপর হয়ে ওঠে। স্বয়ং পঞ্চানন বর্মা এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান এবং বিখ্যাত কবিতা 'ডাং ধরি মোর মাও' লেখেন।

ক্ষত্রিয় সমিতির পরিচালনায় এই সময় পনপ্রথা বন্ধ আন্দোলন জোরদার ভাবে পরিচালিত হয়। রাজবংশী সমাজে বিয়ের পণ নেবার জন্য কন্যাপক্ষের তরফ থেকে পাত্র-পক্ষের কাছে খুবই জুলুম চলত। সামাজিক প্রথানুযায়ী বিয়ে করতে হলে পাত্র-পক্ষের তরফ থেকে কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে হতো। এই টাকা জোগাড় করতে পাত্রপক্ষের হাল এমনই হ'ত যে দু'তিন বিঘা জমি বিক্রয় করে অথবা কর্জ করে পণের টাকা দিয়ে বৌ ঘরে আনতে হ'তো।

ধনী হলে দান যৌতুক সহ ১৬ থান, গরীব হলে ১২ থান (হাতে, কানে, গলায়, পায়ে, মাথায়, নাকে, কপালে, কোমরে, বাহুতে অর্থাৎ অঙ্গের বিভিন্ন অংশে ১৬ বা ১২ রকমের সোনা অথবা রূপার গহনা অন্যান্য জিনিস) দিতে হ'তো। এর সাথে অবস্থা বুঝে পাঁচ-ছয়'শ টাকার উপরেও পনের টাকা দিতে হ'তো। এছাড়া ছিল আরগুয়া, ঈশ্বরবৃত্তি ও দশের সমাজ (আরগুয়া-ঘর ধরা, বিছানা উঠানো ইত্যাদি লোকা-চার, ঈশ্বরবৃত্তি-ঈশ্বরের পূজার জন্য দান, দশের সমাজ-সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভোজনবাবদ দান)।

এই নিয়মের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় সমিতি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, বিয়ের পণ সহ আরগুয়া বাবদ দুই টাকা, ঈশ্বর বৃত্তির জন্য দুই টাকা এবং অন্যান্য দুই টাকা এই মোট ছয়টাকা এবং দশের সমাজের জন্য পাঁচটাকা দশ আনা, সর্বসাকুল্যে মোট এগার টাকা দশ আনা পাত্র পক্ষ কন্যা পক্ষকে দেবে। অথবা মেয়ের বাবা কিছু দেবেও না নেবেও না, এই নিয়ম প্রচলন করেন। ১৬ থান বা ১২ থান এই প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও চার থানে অর্থাৎ হাতে, কানে, গলায় ও পায়ে দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়।

এই সময়ে বুকানি না পরা আন্দোলন শুরু হয়। ঐ সব জেলায় রাজবংশী সমাজের অধিকাংশ মেয়েরা যত্রতত্র বুকানি ও পুরুষেরা নেংটি পরে যাতায়াত করতো। এই পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরা বাড়ীবাড়ী গিয়ে প্রচার করে জানায় যে, মেয়েরা ও পুরুষেরা যেন বুকানি ও নেংটির পরিবর্তে গোটা কাপড় পরে যত্রতত্র যাতায়াত করেন। নেংটি ও বুকানি পরে যত্রতত্র যাতায়াত করলে লোক নিন্দার বিষয় হয়। এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় মেয়েদের হাটে বাজারে যাওয়া বন্ধ আন্দোলন। এদের সমাজে অধিকাংশ মেয়েরাই হাটে ও বাজারে যাবতীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা ও বিক্রি করতে যেতো। সমিতি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মেয়েদের হাটে ও বাজারে যাতায়াত করা নিষেধ। কারু বিশেষ কিছু যদি কিনতে বা বিক্রী করতে হয়, ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরাই সে ব্যবস্থা

করে দেবে বলে জানায়। আদেশ অমান্য করেও যারা হাটে বাজারে যেতো, ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরা তাদের মুখে আলকাতারা লাগিয়ে দিতো। এ আন্দোলনও তখনকার মত সাফল্য লাভ করে। এছাড়া প্রয়োজনবোধে গরীবের বিয়েতে ও শ্রাদ্ধে সাহায্যদান, বিধবাদের বিয়েতে সাহায্যদান প্রভৃতি সামাজিক কাজে ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যরা স্বীয় উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতেন।

গ্রামীন লোক জীবনে প্রবাদ প্রবচন

গ্রামীন লোকজীবনের জীবিকা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। মানুষের জীবিকার এই প্রেক্ষাপটেই নির্ণীত হয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতির সংমিশ্রনের অনুরূপ হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সম্মিলিত ভাবে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার করেছে।

ভাষা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক আচার-আচারণের নিরিখেই উত্তরবঙ্গের গ্রামীন জীবনে বিভিন্ন লোকভাষা যেমন, কোচ-কামরূপী, কাইথিবাংলা প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। এইসব লোকভাষার মাধ্যমে মুখে মুখে রচিত হয় বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন। লোকজীবনে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি নর-নারীর জীবন চরিত, ঐতিহাসিক পটভূমি, লৌকিক দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনী, খাদ্যপ্রিয়তা, স্থান, পাখ-পাখালী বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত প্রবাদ-প্রবচন এখনও প্রচলিত হয়ে আসছে। এখানে তার কিছু পরিচয় দেওয়া হ'ল ঃ

অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করলে তা সংশোধন করা সম্ভব হয় কিন্তু, জ্ঞানবশতঃ অপরাধ করলে তা ক্ষমাযোগ্য হয় না। প্রবাদটি হল,

অগিয়ানে করিলে পাপ—গিয়ানে হইলে সারে
গিয়ানে করিলে পাপ—সাঙ্গে না নড়ে

দঃখের দিনে ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়। আবার ধনী হয়ে গর্ব প্রকাশ করাও ঠিক নয়। প্রবাদটি,

'অধিকো ধনী হয়া না হই কাতর,
অধিকো ধনী হ'য়া না হই চিতর'

যত্ন না নিলে মূল্যবান জিনিসও নষ্ট হয়ে যায়। প্রবাদে এই চিত্রও ধরা পড়েছে,

'ছাওয়ার হাতত্ পৈল ডিমা
নাড়তে চাড়তে নিক্লাইল কুসমা'
'তুই বাছা সত্যৎ থাক্
আন্ধার রাতিত তোর মিলিবে ভাত,

অর্থাৎ সৎপথে থাকলে বিপদ হলেও ভাতের অভাব হয় না।

'পরভাতি হই
তেঁও পরহাতি না হই'

অর্থাৎ নিজের উপর নির্ভর করে চলা উচিত। পরনির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

'কু—পুত্রক ধন দেই—না
সু—পুত্রক ধন লাগেনা'

অর্থাৎ অসৎপুত্রকে ধন দিলে তার অপকারই করা হয়।

কর্মীর কখনই খাওয়ার অভাব হয় না। চিত্রটি প্রবাদে ধরা পড়েছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে পখী পড়ে
আপনার আহার আপনি করে।

পুত্রবধূ ধান ভানতে গিয়ে সন্তানকে স্তনদেবার অছিলায় জিরিয়ে নিচ্ছে, শাশুড়ীকে ফাঁকি দিচ্ছে। প্রবচনে এই চিত্র ধরা পড়েছে।

'নদীর পাড়ের ধুলধুলা মাটি
চাউল কাঁড়ে সরকারের বেটী
চাউলোতে পাড় দেয়, ছাওয়াকো কোলত নেয়
কোল্‌ত নিয়া দেয় দুধ, শাশুড়ীক দেয় কামের বুঝ'

জামাই ঘরে এসেছে, তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা-তামাশা চলছে। চিত্রটি লোকপ্রবচনে ধরা পড়েছে,

'বাপের বাড়ীর কৈতর জোড়া মোরে বাড়ীত্ পড়ে
ব্যাত-বাড়ী দিয়া কৈতর জোড়া উড়িয়া যা রে
ব্যাতের আগাল আন্দো মুই ঘিত-মধু দিয়া
জাঙোই আসিছে ঘিত মধুর বাসেনা পায়া
খা জাঙোই গুয়া পান, বেটিক দিয়া করিম দান
কইনা আসিল হাসিয়া, ছাতি ধর টাঙেয়া
ছাত্তির উপর গামছা, টিলিমিলি তামশা'

উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে খোঁজ করলে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন লোকভাষায় রচিত এইসব প্রবাদ-প্রবচনের একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য্য রয়েছে। পরিবর্তনশীল জগতের বহু রীতিনীতির কথাই প্রবাদ-প্রবচনে ধরা পড়ে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে জানার জন্য এইসব প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্বও অপরিসীম।

———

পরিশিষ্ট

পরিভাষা

মাহান্তালি—কবিরাজী।

বাহান্নপট্টি—৫২টি মৌজা।

যোগতী—বিশিষ্ঠব্যক্তিদের সম্মেলন।

জাঙোই—জামাই।

চারখুটিয়া—মাটির চারটিপাত্র একত্রিত করে তৈরী, জিনিসপত্র রাখার বস্তু।

কুঁইছোয়া—কুঁয়ো বা ইঁদারা ছুঁয়ে যে পূজা। পাঁচজন মহিলা একত্রিত হয়ে এ পূজা করেন।

ডেপগুলা—কলার থোর কেটে তৈরী। এ বস্তুটিতে খাবার পাত্র রূপে ব্যবহার হয়।

কান্‌জি—একধরনের মাদক দ্রব্য।

কাইথিবাংলা—হিন্দি বাংলা মিশ্রিত ভাষা।

চুনাতি—চুনরাখার পাত্র।

টেঁকি, টকা, তাড়ি—সরিষার তেল রাখার ছোট, বড় পাত্র।

ঢাকন—সরার মত পাত্র।

পেচী—তেলরাখার বস্তু।

মহামায়ীঠাকুর—অগ্রাহয়ণ মাসে নবান্নেরদিনে এইপূজা হয়।

কয়থা—একহাত দেড়াহাত পরিমান লম্বা একধরনের ফল। একে কেউ কেউ দুম্বা ও শিবচরণ বলে।

কইচা—কাস্তের মত অস্ত্র, যা দিয়ে ধান কাটা হয়।

থান—উঁচুমাটির বেদী-যেখানে দেব-দেবীকে বসিয়ে পূজা করা হয়।

ভাঙ্গন—সাহায্য অর্থে যে অর্থ তোলাহয়।

মহত—সমাজ পতি অর্থাৎ সমাজের যিনি প্রধান।

নিতানঠাকুর—নিত্যানন্দঠাকুর।

জগমোহন—জগন্নাথঠাকুর।

মুরথী—খৈ ও গুড়ের তৈরি।

খেড়খেড়ি—জ্বালানী।

মায়—মেয়ে।

গুয়া—সুপারি।

বাউ—আদরের সম্বোধন।

থুইস—রাখা অর্থে।

নিন্দদুতে—ঘুমান অবস্থায়।

সিংঝার—পাঠকাঠি।

অংশিয়া—দেখা।

সেটে—সেখানে।

ন-দাড়ি—নারী।

সেঝার দোসর—ভিন্নবিছানা।

আড়ি—বিধবা।

আন্ধে—রান্না করে।

কুপি—লম্ফ।

ছিলিম—তামাক ধরানোর পাত্র।

গাছ কোটা—কাঠের তৈরী পাত্র।

ডিংডই—ঘুনি বা পাটা যার দ্বারা মাছ ধরা হয়।